শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

মে-অগাস্ট ২০১৭

শিখরছোঁয়া স্থপতি

জাহা হাদিদ

খবরে আল-আমীন মিশন: ১৯৯৮-২০১৭

- একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০৮.১৯৯৮।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে চলেছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দমেলা, ০১.০৩.২০০০।
- বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ। —আবদুর রাউফ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.১২.২০০০।
- বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ-সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। —বাহারউদ্দিন, আজকাল (রবিবাসর), ১৮.১১.২০০১।
- দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান। —মিলন দত্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০২.২০০২।
- Mainstream reform from within –Madhumita Bhattacharyya, The Telegraph, 10.09.2002.
- একটি স্কুলের ভর্তিপরীক্ষা, নবজীবনের প্রবেশ পথ। —একরাম আলি, আজকাল, ০৪.০৪.২০০৩।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। —সম্পাদকীয়, কালান্তর, ০৯.০৮.২০০৩।
- ইচ্ছে হাওয়ায়। —কবীর সুমন, আজকাল, ১৭.০৭.২০০৪।
- ধর্ম, সমাজ, ঘেরাটোপ—ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.২০০৫।
- School Bells Echo Amidst Paddy Fields: Al-Ameen Mission has today become a model for excellent education standards. –Islamic Voice, February 2006.
- Hope for Hopeless: It's school that gives those children a chance who have not a penny of their name –Nisha Lahiri, The Telegraph, 02.06.2006.
- রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার নবজাগরণ। —অঞ্জন বসু, সংবাদ প্রতিদিন, ০৩.০২.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন—প্রতিশ্রুতির অন্য নাম। —এস এম সামসুদ্দিন, একদিন, ০২.০৩.২০০৭।
- মূল স্রোতে। —সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০৫.২০০৭।
- Mission Launchpad for poor student –Jhimli Mukherjee, The Times of India, 01.06.2007.
- আল-আমীনের সাফল্য: আত্মশক্তিতে ভরপুর বাঙালি মুসলমানরা।— শেখ ইবাদুল ইসলাম, একদিন, ০১.০৬.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন: স্বপ্ন পূরণের মাইল ফলক। —মহ. সাদউদ্দিন, কালান্তর (রবিবারের পাতা), ১০.০৬.২০০৭।
- Sustained by Donations, Al-Ameen Mission is providing mainstream learning to the community's children. Rajdeep Datta Roy, Live mint.com, The Wall Street Journal, 18.12.2007.
- Mission Possible: It has scripted many a turnaround: picking up poor kids, tutoring them and seeing them off on the road of success. –Jayanta Gupta & Subhro Maitra, The Times of India, 30.04.2008.
- Deprived kids blaze trail of glory: House of dreams. The Al-Ameen Mission has been nurturing talent from underprivileged Muslim Families. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 28.05.2010.
- Al-Ameen Mission-Shelter & Studies. –Bibhas Bhattacharyya, Hindusthan Times, 23.06.2010.
- গৌরব, লজ্জা— সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৫.২০১২।
- A mission that changes lives, helps dreams soar. –The Times of India, 28.05.2013.
- নতুন তারার জন্ম আল-আমিনে। —কৌশিক সরকার, এই সময়, ০৪.০৬.২০১৩।
- সমাজের অন্দর থেকে। —তাজুদ্দিন আহ্‌মেদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০৯.২০১৩।
- আল-আমীন মিশন এক মরূদ্যান, এক অনুঘটক। —একরামূল হক শেখ, স্বভূমি, ০৯.০৩.২০১৪।
- দারিদ্র্য জয় করে উজ্জ্বল আল-আমীন মিশন। —সোমনাথ মণ্ডল, আজকাল, ৩১.০৫.২০১৪।
- আল-আমীনের ছায়ায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ওঁরা।—মনিরুল শেখ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫.০৫.২০১৫।
- Al-Ameen takes mission to Ranchi and Assam. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 19.06.2015.
- আল-আমীন মিশন: পায়ে পায়ে তিন দশক। —এস এম সিরাজুল ইসলাম, একদিন, ০৯.০৮.২০১৬।
- Al-Ameen Mission: West Bengal – Reforming the Society Silently. –Dr. Sadath Khan, Islamic Voice, December 2016.
- Minority Medicine: Muslims of Bengal are embracing education to break free from a certain way of life and age-old stereotyping. –Sonia Sarkar, The Telegraph, 10.09.2017.

আল-আমীন বার্তা

বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪২৪ । মে-অগাস্ট ২০১৭ । শাবান-জ্বিলক্বাদ ১৪৩৮
সপ্তম বর্ষ • তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামূল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

প্রচ্ছদ
ভবনটির নাম: গ্যালাক্সি সোহো। রয়েছে চীনের বেজিং শহরে। আশ্চর্য ভবনটির স্থপতি জাহা হাদিদ।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা • **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

মিশন সমাচার

সর্বভারতীয় পরীক্ষা। ইংরেজি মাধ্যম। প্রথম বারের এনইইটি নিয়ে তাই কিছু মহলে আশঙ্কা ছিল, কেমন হবে রেজাল্ট? সবাইকে তাক লাগিয়ে এ-বারও আল-আমীনের পরীক্ষার্থীরা আশাতিরিক্ত সফল।

৬ পাতায়

স্বপ্নের সিঁড়িতে আল-আমীন

কিংবদন্তি

পৃথিবীখ্যাত আর্কিটেক্ট। তারকাস্থপতি (স্টার আর্কিটেক্ট) গোষ্ঠীর একমাত্র নারী স্থপতি, স্থাপত্যের নোবেল হিসেবে পরিচিত প্রিজকার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা। নিজেকে তিনি মহিলা স্থপতি বলা পছন্দ করতেন না।

লিখেছেন একরামূল হক শেখ

শিখরছোঁয়া আরব স্থপতি জাহা হাদিদ

২৩ পাতায়

সূ চি প ত্র

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত একতিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় উদ্যোগপতি

মোরশেদ আলি মোল্লা

লিখেছেন আসাদুল ইসলাম

১৭ পাতায়

এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগপতির গল্প

বঙ্গাদর্শন

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক।

লিখেছেন অশোককুমার কুণ্ডু

১৩ পাতায়

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

শিখরদেশ

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৭-র উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থান অধিকারিণী (আল-আমীনের মধ্যে প্রথম)

কাজী দিলরুবা খানম

এমন রেজাল্ট মিশনে না এলে হত না

৩২ পাতায়

আমাদের পাতা

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা
মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে।
দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে
সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ।

৩৮ পাতায়

অন্যান্য বিভাগ

উদ্ধৃতি ৪ | সম্পাদকীয় ৫ | স্মরণ ১১ | মুক্তভাষ ৩০ | বিশ্ববিচিত্রা ৩৬

যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারো প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য, সে তো সন্তোষ লাভ করবেই।

— আল-কোরআন, সুরা লাইল, আয়াত ১৮ থেকে ২১

ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন— সঙ্গীর অনুমতি না নিয়ে তোমরা কেউ একসঙ্গে দুটো খেজুর খেয়ো না।

— সহিহ্ বুখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ২৩২৭

উদ্ধৃতি

Mainstream reform from within

Madhumita Bhattacharyya

Calcutta, Sept. 9: "Anti-national" is what chief minister Buddhadeb Bhattacharjee called madrasas in the aftermath of the January 22 attack outside the American Center. A political outcry– and "party pressure"– forced him to back down and call for "modernising" madrasa education.

Around 75 km from Writers' Buildings, the Al-Ameen Mission has been doing just that for the past two decades– ringing in reform that matters, the one from within.

Even the winter morning when blood was being washed off Chowringhee, in Khalatpur village of Howrah district, 163 girls and boys, both Muslim and Hindu, were hard at work, studying for the Joint Entrance Examinations. Months later, the students of Al-Ameen Mission learnt that 133 of them had made it through to either medical or engineering colleges. Little wonder that it won the Amul Award for the Best Academic Performance by a School at The Telegraph School Awards for Excellence last Saturday.

The path to academic excellence and hope for the future is what one man and his Mission– which has grown out of a madrasa– have opened up for thousands of children in Hindu majority Khalatpur. Spread over 60 bighas, Al-Ameen Mission now offers the Higher Secondary course, but still bears evidence of its roots.

In a corner stands the pale-green madrasa that Nurul Islam started when he was in Class XI at Maulana Azad College. Behind it gleams the 43 year old's most cherished achievement– a school and hostel for around 300 girls.

In dormitories, children, heads covered in white, peer out of unpainted windows. They are not allowed "free-mixing" with the 600 boys on the adjacent campus, who are busy getting ready for their evening prayers after day-long classes.

"I want to be a cardiologist so that I can cure ma. I have not being able to take care of her now, but I have to pursue my dream so no one else's mother suffers like mine," confesses Shahabanu Biswas, from Paschim Simla, North 24 Parganas, now in Class XI.

Living hand-to-mouth, it's her sterling academic record that has landed her a berth in the school. The Mission has hostels for Muslims only, but provides non-residential coaching for Joint Entrance to all.

The Khalatpur school is committed to provide the stars of minority communities a fighting chance for success. Of the 133 Joint Entrance successes, 31 cleared the medical entrance while 102 made it into engineering. Local residents still refer to the school as a "madrasa", but no religious training is imparted here. Nurul Islam still runs the "government-registered high madrasa" for locals and points out that it is of the "legitimate" kind.

"We follow the state syllabus. Both Hindus and Muslims attend, and there is only a little more emphasis on Urdu." 'High' madrasas are affiliated to the state Madrasa Board.

A few years after setting up the madrasa, the political science teacher realised that the only way to save the "meritorious" from falling through the cracks was by "mainstreaming" them. "I have seen so many Muslim kids lose their way. I needed a place where I could instil some ambition," says Nurul Islam.

The inspiration behind the "ashram" was the Ramakrishna Mission centre, Gol Park, which the young Islam used to frequent. "There wasn't any safe space here for Muslims to prosper," he says.

"I thought, if we could only come out of the traditional madrasa system, there could be chance of keeping these kids in school."

He went to businessmen asking for *zaqat* money– Ramzan donations that traditionally go to madrasas– to set up a secular school.

Toofan is one of the early Al-Ameen success stories. The son of a Murshidabad dacoit from a village that makes its money out of robbery, he is now a Central government employee. Around 20 others from his village– hitherto untouched by higher education have now joined the Mission.

The boys' residential school, in a corner of a huge field that may soon see new buildings for a library and labs, was built in 1986.

About 600 handpicked boys stay, study and shine here. In 1999, with a Rs 35 lakh donation from the Maulana Azad Education Foundation, New. Delhi, Nurul Islam built a similar school for girls.

"Parents were anxious when the girls' facility opened. They, as the most neglected, in rural Muslim families, needed this school more than anyone else," Nurul Islam says.

Shabnam Bano topped the madrasa exams in Bengal last year. The school learnt of her potential, tracked her down to her Malda home and "recruited" her.

"I know that by staying here, I can become a gynaecologist," smiles the quiet girl, in light-blue blouse and dark-blue skirt.

"There hasn't been a doctor in the villages these kirds come from, possibly in the past 50 years. They are responding to what they feel is the most pressing need," explains Islam.

The Mission provides 40 percent of the children with free or subsidised education. "We have sons of ministers and day-labourers staying and studying together," explains Islam. There is dedicated coaching for residential students appearing for joint entrance, a coachig centre in Calcutta, with another on the cards in Park Circus and one in Birbhum.

The Telegraph | 10 September 2002, Tuesday

একটা সময় ছিল, যখন ইতিহাস বলতে আমরা বুঝতাম রাজাদের ইতিহাস। তাঁদের জন্ম, মৃত্যু, রাজত্বের সাল-তারিখ আর ইতিহাস। মোটকথা, রাজ্য বিস্তারের আর শাসনের কথা। প্রজাদের ঘাম-রক্ত-অনটনের বিবরণ থাকত ছিটেফোঁটা। বা থাকত না। সেই ধারা পরে ইতিহাসবিদরাই পালটে দেন। তাঁদের চোখ যায় সমাজের দিকে, প্রজাসাধারণের দিকে। তাঁরা মনোযোগ দেন সামাজিক ইতিহাস লেখার কাজে। সেই থেকে একটা নতুন বিষয়ই জন্ম নেয়— সমাজতত্ত্ব। আরও পরে ইতিহাসের নানা শাখা রচিত হয়ে জ্ঞানচর্চার এই ধারাটি আজ অজস্রমুখী হয়েছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসও এখন পুরোনো। চর্চা হচ্ছে এমনকী একটা জাতির উদ্‌বেগের ইতিহাসেরও।

মানুষের বা কোনো বিশেষ জাতির স্থাপত্যচর্চার ইতিহাস আগে বিস্তর হয়েছে। তাই বিষয়টি তেমন নতুন নয়। তবু চর্চার এবং প্রচারের অপ্রতুলতায় আমাদের কাছে কিছুটা নতুন। আর, কোনো দেশে একক নারীর উঠে দাঁড়ানোর উদাহরণ হিসেবে নতুন তো বটেই। এই সংখ্যায় তাই থাকছে বিখ্যাত ইরাকি মহিলা স্থপতি জাহা হাদিদ এবং তাঁর আশ্চর্য সব স্থাপত্যকর্ম নিয়ে দীর্ঘ একটি আলোচনা।

মানুষের কোনো কোনো স্থাপত্যকর্ম ছ-হাজার বছরেরও বেশি টিকে আছে। যেন-বা অক্ষয়। যেমন পিরামিড। তাই আমরা মনে মনে কামনা করি একটি পিরামিড তৈরির। বা ওইরকম কিছুর। কিন্তু পারি না। এই না-পারাটাকে অক্ষমতা বলব কি? বলব না। পিরামিড গড়ার লক্ষ্যে একটা ইটও যদি আমরা তৈরি করতে পারি, সেটুকুই সফলতা। একটি ইট তৈরি মানে, ওই স্থাপত্যটি নির্মাণের দিকে এক ধাপ এগোনো। আমাদের আল-আমীনের পড়ুয়ারা মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ-বছরও আশাতীত ভালো ফল করেছে। বলা যেতেই পারে, ওদের সবার হাতে রয়েছে একটা করে স্বনির্মিত ইট, যেগুলো পর পর গেঁথে পরে ওরাই হয়তো আকাশছোঁয়া প্রিজমের মতো কিছু-একটা নির্মাণ করে ফেলবে। যাকে আমরা বলব— পিরামিড! আর, মেডিকেলের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ-বছর প্রধান বাধা ছিল ভাষা। তবু বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেও আল-আমীনের পরীক্ষার্থীরা যে-ফল করেছে, সেটাকে আশ্চর্য ঘটনাই বলতে হবে। তাদের সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

স্বপ্নের সিঁড়িতে

সর্বভারতীয় পরীক্ষা। ইংরেজি মাধ্যম। প্রথম বারের এনইইটি নিয়ে তাই কিছু মহলে আশঙ্কা ছিল, কেমন হবে রেজাল্ট? সবাইকে তাক লাগিয়ে এ-বারও আল-আমীনের পরীক্ষার্থীরা আশাতিরিক্ত সফল। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট রেখেছে তারা। সেইসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঐতিহ্য রচনা করেছে আল-আমীন।

আসাদুল ইসলাম

সাফল্যের পথ ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে আল-আমীন মিশন। ২০১৭ সালের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে আগের বছরগুলোর মতোই ভালো ফল করে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ২০১৭-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৬৮ জন। এর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে ২২৭ জন। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৭৫৪ জন। ৯৯৯ জন ৭০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। ৯৭.৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে আব্দুল মালেক খান। রাজ্যের ১০ লক্ষ ৬১ হাজার ১২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দশম স্থান পেয়েছে আব্দুল মালেক। এ-বার মাধ্যমিকে প্রথম হওয়া অন্বেষা পাইনের থেকে মাত্র ৯ নম্বর কম পেয়েছে মালেক। মালেক পেয়েছে ৬৮১ নম্বর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলি থানার কোচিয়ামারা গ্রামে বাড়ি তার। তার ম্যাট্রিক পাস আব্বা আবুল কালাম খান অটো চালিয়ে সংসার চালান। নাইন পাস তার মা মারুফা খান গৃহবধূ। আব্দুল মালেক ক্লাস সেভেন থেকে আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করেছে। এমন শিখরছোঁয়া স্বপ্ন দেখার সাহস পায়নি তার পরিবারের কেউই। আল-আমীন মিশন শুধু আর্থিক সহায়তা দিয়েই পাশে দাঁড়ায়নি, মালেকদের বুকে স্বপ্ন দেখার সাহসও জুগিয়েছে। সেই ভরসাতেই মালেক আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে।

আল-আমীন

ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে আল-আমীন মিশনকেই তার শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছে। পড়ছে আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায়। একইরকমভাবে আব্দুল মালেক খানের চেয়ে মাত্র ১ নম্বর কম পেয়ে রাজ্য স্তরে একাদশতম স্থান পাওয়া আফতাব আহমেদের কথাও বলা যায়। কারখানাশ্রমিক উচ্চ-মাধ্যমিক পাস আনিসুর রহমানের পুত্র আফতাব। তাদের বাড়ি বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার চাকটা গ্রামে। আফতাব পঞ্চম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনে পড়ছে। আফতাব আর মালেক একই আর্থসামাজিক স্তরে অবস্থান করলেও তাদের স্বপ্নেরা ভিন্ন পথ ধরে সুদূরের পানে ধাবিত হতে চায়। আব্দুল মালেক ডাক্তার হতে চাইলেও আফতাব হতে চায় গবেষক। আইআইটি পড়ে সে গবেষণায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে এখন। আল-আমীন মিশন থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়া মিস রুমানা রাজ্য স্তরে সতেরোতম স্থান দখল করেছে। মালদা জেলার কালিয়াচক থানার দৌলতটোলা গ্রামে বাড়ি রুমানার। আব্বা এক্রামুল হক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মা জুবেদা বিবি পার্শ্বশিক্ষিকা। রুমানা পঞ্চম শ্রেণি থেকেই আল-আমীন মিশনের ছত্রছায়ায় নিজেকে গড়ে তুলেছে। সে 'বড়ো' ডাক্তার হতে চায়। রুমানা তার স্বপ্নের আকার বোঝাতে বড়ো শব্দটাকে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে। রাজ্য স্তরে ২০১৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাড়ে দশ লাখের বেশি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে মোট ছ-জন আল-আমীন মিশন থেকে স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরও চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে। এ-বছর প্রথম কুড়ি জনের তালিকায় মিশনের দশ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম আছে। আল-আমীন মিশনের এ-বারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল মোট ১০৬৮ জন, সেখানে উচ্চ-মাধ্যমিকে শুধু ছাত্র ১০৭৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী মিলে ২০১৭ সালে মোট উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১৬৮৫ জন। প্রায় সবটাই ছিল বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ছিল মাত্র ১০৬ জন। ২০১৭ সালে রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২০ জন। পাশের হার ৮৪.২০ শতাংশ। এই সাড়ে সাত লাখের বেশি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আল-আমীন মিশনের ছাত্রী কাজী দিলরুবা খানম রাজ্য স্তরে দশম স্থান অধিকার করেছে। এখনও পর্যন্ত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের সেরা র‍্যাঙ্ক এই দশম স্থানই। গত বছরও আল-আমীন মিশনের ছাত্রী তহমিনা পারভিন দশম হয়েছিল। কাজী দিলরুবা খানমের অন্য একটি বিশিষ্টতা আছে— সে মাদ্রাসায় পড়া ছাত্রী। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করেছে মাদ্রাসায়। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় সে রাজ্য স্তরে তৃতীয় হয়েছিল। মাদ্রাসায় পড়ে মানে তার বুদ্ধির ঘটে কিছু নেই— এই ভাবনায় আঘাত হেনেছে দিলরুবা। আল-আমীন মিশন যদিও অনেক আগেই মাদ্রাসা-পড়ুয়াদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার নজির রেখেছে। দিলরুবার হাত ধরে এ-বছর আরও এক নতুন নজির তৈরি হল। এই সংখ্যার 'আল-আমীন বার্তা'র 'শিখরদেশ' বিভাগে দিলরুবার বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দিলরুবা সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কিছুই জানতে পারবেন। তাই দিলরুবা ছাড়া অন্য ছাত্র-ছাত্রীর কথায় আসি। একটু আগেই আপনাদের জানিয়েছি এ-বছর আল-আমীন মিশন থেকে রাজ্য স্তরে প্রথম কুড়ির তালিকায় আছে দশ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম। এই দশ জনের মধ্যে চার জন ছাত্রী। রাজ্য স্তরে ১৯-তম স্থানে আছে হাবিবা আক্তারের নাম। হাবিবা পেয়েছে ৯৪.২ শতাংশ নম্বর। এ-বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মেয়েদের অত্যন্ত ভালো ফল করা। বিশেষ করে মেধা-তালিকার প্রথম দিকে মেয়েরা নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে। এ-বছর ১০৭৬ জন ছাত্র এবং ৬০৯ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ১০৭৬ জন ছাত্রের মধ্যে যেখানে ৩৮ জন ছাত্র ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে, সেখানে ৬০৯ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪৯ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে যদিও সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের ছবি এটা, তবু নির্দ্বিধায় বলা যায় সমাজের মেয়েরা যে দ্রুতহারে এগোচ্ছে, তার ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট। এবার আমরা কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রীর কথা উল্লেখ করে ২০১৭ সালের সাফল্যকথার অন্য পর্বে যাব। উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্য স্তরে একাদশতম স্থানে আছে আল-আমীন মিশনের দু-জন ছাত্র। মহম্মদ তুহিন রানা ও মহম্মদ সিনান হাম্মাম মিয়া। পেয়েছে ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর। সিনান হাম্মামের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার ইতাসারণ গ্রামে। আব্বা হাই স্কুল টিচার। মা গৃহবধূ। এক দাদা এমবিবিএস পড়ছেন। ছোটোভাই আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায়

আব্দুল মালেক খান।
মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম।

কাজী দিলরুবা খানম।
উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম।

একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। হাম্মামও খলতপুর শাখা থেকেই পরীক্ষা দিয়েছিল। রাজ্য স্তরে মেধা-তালিকায় চোদ্দোতম স্থানেও আছে দু-জন। আফরিন সুলতানা ও সেখ আকিব উদ্দিন। পেয়েছে ৯৫.২ শতাংশ নম্বর। আফরিনের বাড়ি কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকার বদরতলায়। আব্বা-মা দু-জনেই মাধ্যমিক পাস। আব্বা ব্যাবসা করেন, মা গৃহবধূ। মেটিয়াবুরুজের আর-একটি মেয়ের কথা বলতেই হয়। তার নাম শাহীন পারভিন। মাত্র ৫২ শতাংশ নম্বর পেয়ে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল। নম্বর কম থাকায় বিজ্ঞানের বদলে কলা বিভাগে পড়ার পরামর্শ মেনে নিয়েছিল সে। শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও সে পড়াশোনা করাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেলপুকুর শাখায় ভর্তি হতেও পিছপা হয়নি। শাহীন তার একাগ্রতা আর মিশনের পড়াশোনার পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে। মাধ্যমিকে ৫২ শতাংশ নম্বর পাওয়া শাহীন উচ্চ-মাধ্যমিকে পেয়েছে ৯২ শতাংশ নম্বর। এই দুই মেয়ের সাফল্য সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত মেটিয়াবুরুজকেও গর্বিত করেছে। রাজ্যের বস্ত্রব্যাবসার পীঠস্থান এই এলাকা। অল্প পড়াশোনা করে পরিচিত ব্যাবসায়িক পথে উপার্জনের সুযোগ থাকায় এলাকার ছেলে-মেয়েরা অনেকটাই পড়াশোনা-বিমুখ। শিক্ষাবিকাশের কাজে অর্থ অনুদান দেওয়ার সুনাম আছে এই এলাকার। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে সেই শিক্ষাবিমুখতা কাটছে। তারই ফল আফরিন-শাহীনের এই সাফল্য। আফরিন-শাহীনের সাফল্য এলাকার ছেলে-মেয়েদের নিশ্চিতভাবেই অনুপ্রাণিত করবে।

এবার আসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলে। ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্সে এ-বছর আল-আমীন মিশন থেকে মেধা-তালিকায় ১৫ হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে ১৫২ জন। গত বছরের তুলনায় এ-বছরের ফল অনেকটাই ভালো হয়েছে। গত বছর ১৫ হাজারের

আসিফ ইকবাল হোসেন।
মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৩৪১।

আম্বিয়া সুলতানা।
মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৩৮১।

মধ্যে ১১০ জন র‍্যাঙ্ক করেছিল। আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিঙের চেয়ে মেডিকেল পড়ার ঝোঁক বেশি। সেদিক থেকেও এ-বারের ফল গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মিশন থেকে এ-বছর সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে বর্ধমান জেলার আস্তিকপুর গ্রামের শেখ আজহারুল হক। এ-বছর সে উচ্চ-মাধ্যমিকেও ভালো ফল করেছে। ৭৪৮ র‍্যাঙ্ক করে দ্বিতীয় হয়েছে সাদরুল আলম মোল্লা। তার বাড়ি বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার কেউদিয়া গ্রামে। একাদশ শ্রেণি থেকে সে মিশনে পড়েছে। আল-আমীন মিশনের বর্ধমান শাখার আর-এক কৃতী ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ৮০১ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে। জাহাঙ্গীর এ-বছরই উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছে ৯২.৪ শতাংশ নম্বর। মিশনের মধ্যে চতুর্থ র‍্যাঙ্ক মনসুর হাবিবুল্লাহর। রাজ্য স্তরে তার র‍্যাঙ্ক ১০৩১। দুস্থ মেধাবী এই পড়ুয়ার বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগ থানার পুরাণ গ্রামে। তার পিতা সেখ আব্দুল রাহিল দর্জির কাজ করে পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালান কষ্ট করে। মাধ্যমিকের পর তিনি হাবিবুল্লাহকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর এক বছরের জন্য কোচিং নেয় হাবিবুল্লাহ। খুব সামান্য বেতন নিয়ে আল-আমীন তাকে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। একইরকমভাবে দিনমজুর পিতার সন্তান সেখ সবুর আলিরও পাশে দাঁড়িয়েছে মিশন। হুগলি জেলার খানাকুল থানার বলপাই গ্রামের এই ছাত্রটির র‍্যাঙ্ক ১১৪৮, মিশনের মধ্যে পঞ্চম।

শেখ আজহারুল হক।
ইঞ্জিনিয়ারিঙে র‍্যাঙ্ক ৫০৭।

সব ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলার সুযোগ এখানে নেই, তাই এবার আমরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের ফলের কথা আপনাদের জানিয়ে এ-লেখায় ইতি টানব। এ-বছর সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা ছিল সর্বভারতীয় অভিন্ন মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট বা নিট ঘিরে। প্রাথমিক উৎকণ্ঠার কারণ ছিল অভিন্ন প্রশ্নপত্রের কথা বলা হলেও আদতে দেখা গেল সব ভাষার পরীক্ষার্থীদের জন্য একই প্রশ্ন রাখা হয়নি। বিশেষ করে বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগ যে অনেকটাই সত্যি, তা প্রমাণিত হয় ফল বের হওয়ার পর। দেখা যায় উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রথম দশে থাকা মেধাবীদের অনেকেই নিটের গণ্ডি পার হতে পারেনি। উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম দশে ছিল ৫৩ জন। নিটে বসেছিল ৪৬ জন। এদের মধ্যে ৩০ জনই নিটের গণ্ডি পার হতে পারেনি। আরও একটি হতাশাজনক বিষয় ঘটেছে নিট পরীক্ষা ঘিরে। পশ্চিমবঙ্গে গত চার দশকে গড়ে ৭১ থেকে ৭৬ শতাংশ ডাক্তারি আসন বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের দখলে থাকত। আর এ-বছর বাংলা মাধ্যমের মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ পড়ুয়া সুযোগ পেয়েছে। আমরা সকলেই জানি বাংলা মাধ্যম মানে গ্রাম, বাংলা মাধ্যম মানে গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে। ইংরেজি মাধ্যমের ধনী ঘরের পড়ুয়াদেরই চক্রান্ত করে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে এমন অভিযোগও তুলেছেন অনেকেই। এই ব্যবস্থাপনা কতটা দুর্ভাগ্যজনক বোঝা যায় যখন দেখা যায় রাজ্যের প্রথম ২৫০ এমবিবিএস আসনে বাংলা মাধ্যমের পাঁচ জন পড়ুয়াও নেই। এমনিতেই অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ-রাজ্যে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা কম, চালু কলেজগুলোতেও আসনের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। ফলে রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সামনে সুযোগ সীমিত অবস্থা থেকে আরও সীমিত হয়ে গেছে। এইরকম এক ভয়ংকর অবস্থার মাঝেও আল-আমীন মিশন তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিট পরীক্ষার নিরিখে নির্ধারিত এ-রাজ্যের মেধা-তালিকায় তিন হাজারের মধ্যে আল-আমীন মিশনের ২৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী র‍্যাঙ্ক করেছে। বাংলা মাধ্যম থেকে রাজ্যে ডাক্তারি পড়তে সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর ৭০

শতাংশই আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া। মিশন থেকে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে নয়াবাজ শাখার ছাত্র আসিফ ইকবাল হোসেন। রাজ্য স্তরে তার র‍্যাঙ্ক ৩৪১। মালদা জেলার গোপালপুর গ্রামে বাড়ি আসিফের। আব্বা মহম্মদ শরীফ হোসেন হাই মাদ্রাসার শিক্ষক। কিন্তু প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী। আসিফের ফল তার বাড়ির সকলের কাছে আশার নতুন আলো বয়ে এনেছে। মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক আম্বিয়া সুলতানার। মালদা জেলার এই ছাত্রীর র‍্যাঙ্ক ৩৮১। রাজ্য স্তরে ৩৯১ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে সেখ মাসুদুল কবীর। তার বাড়ি হাওড়া জেলার বাগনান থানার গোহালবেড়িয়া গ্রামে। তার পিতা সেখ সফিউল্লাহ শিক্ষকতা করেন। চাকুরিজীবী বাবা-মায়ের সন্তানদের পাশাপাশি শ্রমজীবী, অল্প পড়াশোনা জানা বাবা-মায়ের ছেলে-মেয়েদের সামনে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েই সামগ্রিকভাবে সমাজোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আল-আমীন মিশন। সেই প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষক সফিউল্লাহর পুত্র যেমন ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পায় তেমনি মাধ্যমিক পাস কাঠের ব্যবসায়ী সামাদ ঢালির কন্যা মৌমিতা খাতুন বা প্রান্তিক চাষি সেখ আব্দুল হকের কন্যা বিলকিস পারভিনও ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে পেরেছে। রাজ্যে ইংরেজি

> এমন শিখরছোঁয়া স্বপ্ন দেখার সাহস পায়নি তার পরিবারের কেউই। আল-আমীন মিশন শুধু আর্থিক সহায়তা দিয়েই পাশে দাঁড়ায়নি, মালেকদের বুকে স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছে।

মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা কি যথেষ্ট? সেখানে কি কম পড়াশোনা জানা বাবা-মায়ের ছেলে-মেয়েদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়? গরিব মানুষ কি সেইসব স্কুলে পড়ার খরচ জোগাতে সক্ষম? এই সব ক-টা প্রশ্নের উত্তর— না। তাহলে কি গ্রামবাংলার ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না? এ-বছর নিট পরীক্ষার ফল বলছে— না, দেখবে না। কিন্তু আল-আমীন মিশনের ফল বলছে— দেখবে, অবশ্যই তারা স্বপ্ন দেখবে। যতদিন আল-আমীন মিশন আছে ততদিন অন্তত স্বপ্ন দেখা শেষ হবে না।

নয়াবাজে ইফতার মজলিশ

১২ জুন আল-আমীন মিশন একাডেমি, নয়াবাজ শাখায় এক ঘরোয়া ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। এই ইফতার মজলিশে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম একমাসব্যাপী রোজা রাখার সামাজিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, আমাদের দেশে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবাসের চল এ-কথাই প্রমাণ করে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ত্যাগ ও সংযম জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় আমাদের বেশি-বেশি করে ত্যাগের চর্চা ও অনুশীলন করা দরকার।

কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পাঠরত নয়াবাজ শাখার প্রাক্তনী, ছাড়াও এই মজলিশে সমস্ত পড়ুয়া, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ছাড়াও ডব্লিউবিসিএস অফিসার রাকিবুর রহমান, স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন ও মিশনের বিভিন্ন শাখার বেশ কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। নয়াবাজের ইনচার্জ খন্দকার মহিউল হকের ব্যাবস্থাপনায় পুরো আয়োজনটি খুবই সুন্দর হয়ে ওঠে।

রাজ্যজুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম ও ত্রিপুরায় বিস্তৃত আল-আমীন মিশনের সমস্ত শাখায় দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালিত হল দেশের একাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মিলিতভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় প্রত্যেক ক্যাম্পাসে। ছাত্র-ছাত্রীরা গানে ও কবিতায় অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই শুভদিনে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় বিশিষ্টজনের উপস্থিতি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধিকারিকগণ স্বাধীনতাসংগ্রামী বীর শহিদদের দেশপ্রেম ও আত্মবলিদানের কাহিনি শুনিয়ে পড়ুয়াদের উদ্‌বুদ্ধ করেন।

খলতপুরে মূল শাখায় হয় মিশনের প্রধান অনুষ্ঠান। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। সহযোগিতা করেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিন্টেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম।

ইংরেজি মাধ্যমের দ্বিতীয় শাখা খড়্গপুরে

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর এক বর্ধিষ্ণু রেল জংশন শহর। গত ১৬ এপ্রিল মিশনের দ্বিতীয় ইংরেজি মাধ্যম শাখা আল-আমীন একাডেমি,

খড়্গপুরের শুভ সূচনা হয় এখানে। উল্লেখ্য, ইংরেজি মাধ্যমের প্রথম শাখা শিলিগুড়ির মিলনমোড়ে গত ২০১৪ সালে শুরু হয়।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ব্যবসায়ী হাজি সেখ আব্দুল আজিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, হাজি সাহেবদের দানকৃত সাত বিঘা জমির ওপরেই গড়ে উঠেছে মিশনের এই শাখা। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যেই মিশনের প্রায় ১৮০০ ডাক্তার ও ১৯০০ ইঞ্জিনিয়ার-সহ বহু শিক্ষক, প্রফেসর, অফিসার, গবেষক প্রমুখ প্রাক্তনী রাজ্য, দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া গত তিন বছর ধরে মিলনমোড়ের ইংরেজি মাধ্যম শাখাটিও সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। বর্তমানে খড়্গপুর শাখায় পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ১২০ জন আবাসিক ছাত্র সুযোগ পেলেও ভবিষ্যতে এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলা মাধ্যমের মতো ইংরেজি মাধ্যমেও মিশনের সাফল্য রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিধায়ক আখরুজ্জামান ইংরেজি জানা না-জানা নিয়ে তাঁর নিজ জীবনের শিক্ষণীয় কাহিনি তুলে ধরেন। তিনি মিশনের এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করে বলেন, কলকাতার বহু নামিদামি কনভেন্ট স্কুলে সুযোগ পেয়েও তিনি সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে ছুটে এসেছেন তাঁর পুত্রকে মিশনে ভর্তি করাতে। কারণ, এখানে যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার সমান্তরাল ব্যবস্থা রয়েছে।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রস্তুতির বিশিষ্ট শিক্ষক নূর আলম বলেন, তিনি ইংরেজি মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকদের মিশনে পড়াবার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। কলকাতার এক নামি বিদ্যালয়ে পাঠরত তাঁর পুত্রকে তিনিও এ-দিন মিশনে ভর্তি করান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জমিদাতা হাজি সেখ আব্দুল আজিজ, কাজি আব্দুল রশিদ, সেখ রুহুল আমিন, মিসেস মেহবুবা আলি প্রমুখ।

রাঁচি শাখায় ইফতার মজলিশ

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে ২০১৪ সাল থেকে মিশনের ইংরেজি মাধ্যম বালক-শাখায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা তাদের নির্দিষ্ট সিলেবাসের সঙ্গে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে। গত ১৯ জুন এই শাখায় এক ছোটো ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ইফতার অনুষ্ঠানের পর পাটনার বালিকা-শাখা ও এই শাখার শিক্ষাকার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তা ও স্থানীয় বিশিষ্টজনের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন, আমাদের যেকোনো কাজে চেষ্টার যেন ত্রুটি না থাকে এবং উৎকর্ষের প্রশ্নে প্রতিনিয়ত নিজেদের আপডেট রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবু বাক্কার সিদ্দিকি, আইএএস, ড. সাম্‌স তাবরেজ, আইপিএস, ডেপুটি এসপি আরিফ একরাম, আবু ইমরান প্রমুখ সরকারি আধিকারিকগণ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ইবরার সাহেব, ড. আসলাম পারভেজ, সাউদ আকতার, উবাইদুল্লা কাসমি, গিয়াসুদ্দিন মণ্ডল, ইবাদুল্লা সাহেব প্রমুখ। রাঁচি ও পাটনা শাখার আল-আমীনের স্থানীয় অভিভাবক ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. মাজিদ আলম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ■

স্বদেশি মননের প্রবাসী বাঙালি

সেখ আকবর হোসেন

(১৯৪২—২০১৭)

'তাঁর ছিল বিশাল দুঃসাহসী সিদ্ধান্তের স্প্রিংবোর্ড, যার অভিঘাতে তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সেখান থেকে তাঁকে আর কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।' এ-কথাগুলো সেখ আরিফ হোসেনের, সদ্যপিতৃহারা এক পুত্রের। কেবলই সন্তান নন, তিনি ছিলেন তাঁর আব্বা সেখ আকবর হোসেনের বিশ্বাসের পাত্র, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ব্যাবসায়িক অংশীদার এবং প্রধান সহযোগী।

১৯৬৪ সাল। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলেন দুঃস্থ পরিবারের এমন এক তরুণ, মাত্র ছ-মাস বয়সে যিনি পিতৃহারা। বড়ো হয়েছেন দাদিজানের মমতাময় কোলে। বহুদিন তাঁকেই মা বলে জানতেন। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসও স্বস্তি দিল না তাঁকে। ওই বছরই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এমন মাত্রা নেয় যে, বিকল্প চিন্তা করতে হয় তাঁকে। নিরুপায় হয়ে তিনি পরের বছর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমান। দেশ ছাড়েন যখন, নিজের হাতঘড়ি বিক্রি ও দাদির জমানো টাকা মিলিয়ে হাতে মাত্র ৪৮০ টাকা। এমনকী, এত এত পরীক্ষা-পাসের গৌরবচিহ্ন— কোনো প্রমাণপত্রই ছিল না তাঁর সঙ্গে। ছিল শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. ত্রিগুণা সেনের একটি শংসাপত্র। সেই শংসাপত্র দেখিয়েই ঢাকায় পেয়ে যান বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকরি। সেই চাকরি থেকে স্বচেষ্টায় ক্রমে পৌঁছে যান এমন এক উচ্চতায়, যা কল্পনাতীত।

সেখ আকবর হোসেন। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৪২, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ব্লকের এক গণ্ডগ্রাম খলিসানি পশ্চিমপাড়ায়।

কী কারণে তিনি সাধারণের ভিড়ে অসাধারণ? তিনি তাঁর শিকড় কোনোদিন বিস্মৃত হননি। লন্ডনপ্রবাসী হয়েও মানসিকতায় তিনি ছিলেন পুরোপুরি স্বদেশি। কথা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি একরাম আলি জানালেন, আকবর হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতায় মনে হবে না তিনি তিন দশক লন্ডনপ্রবাসী। তাঁর ঝরঝরে বাংলায় হাওড়া জেলার অদ্ভুত এক টান ছিল, দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে থেকে যা একবিন্দুও ক্ষয়ে যায়নি। শুধু সেটুকুই নয়, তাঁর এই প্রবাসজীবনে তিনি যখনই সময় পেয়েছেন, জন্মভূমির টানে ছুটে চলে এসে মিশে গেছেন ওই জনপদের বাসিন্দাদের সঙ্গে।

১৯৬৯ সালে, খুলনায়, তিনি আনোয়ারার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সরকারি চাকরির সামান্য বেতনে তাঁদের চলবে কী করে, এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে ১৯৭১ সালে শুরু করেন নিজস্ব উদ্যোগ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্টারপ্রাইজ। সেটিরই ১৯৭৩ সালের নাম প্রকৌশলী পর্ষদ লিমিটেড। বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি বাংলাদেশের প্রথম ১৩২ কেভি-র সাবস্টেশন দিয়ে শুরু হল তাঁর যাত্রা। কয়েক বছর পর এক লিবিয়ান কোম্পানি ঢাকায় আসে ইঞ্জিনিয়ারের খোঁজে। সুযোগ পেয়ে আকবর হোসেন লিবিয়ার ত্রিপোলিতে পৌঁছে যান বেশি বেতনের আশায়। বিপদ শুরু হল সেখানে গিয়ে। তাঁরা চাকরি নয়, কোম্পানির মাধ্যমে তাঁদের দেশে সাব-স্টেশনের কাজ করাতে চান। তাঁর ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু ব্যাবসার টাকা নেই। মুখ্যত লিবিয়ান কোম্পানির এক যুগোস্লাভ কর্তার সহায়তায় লিবিয়ান-যুগোস্লোভিয়ান কোম্পানি তৈরি হল। দুনিয়ার সেরা কোম্পানি সিমেনস, ইউনিটেককে টপকে আকবরদের কোম্পানি ন-টি সাব-স্টেশন নির্মাণের কাজ পায় সেখানে। ব্যাস, তারপর থেকেই আরববিশ্বে আকবর হোসেনের ব্যাবসার গ্রাফ বরাবরই ঊর্ধ্বমুখী।

বাবার জীবনযাপন ও কর্মসংস্কৃতির গভীর অনুধাবন করেছেন বড়োছেলে অক্সফোর্ড-শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার সেখ আরিফ হোসেন। তিনি জানাচ্ছেন, 'ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে যখনই তিনি যুদ্ধ করেছেন, সিংহের মতোই করেছেন। জবাব হিসেবে 'না' শোনা অপছন্দ ছিল তাঁর। কারণ, কাজকর্মের যেকোনো প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলার জন্য তিনি সবসময় প্রস্তুত থাকতেন, যে-ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকত যে, তিনিই ঠিক। কিন্তু যখন কোনোকিছুর জন্য তিনি না-সূচক সিদ্ধান্ত নিতেন, সেখান থেকে তাঁকে ফেরাবার মানুষ হাতে গোনা কয়েক জনই ছিলেন। সেই অল্প কয়েক জনের মধ্যে আমিও সৌভাগ্যবান একজন। যাঁরা একবার তাঁকে সুযোগ দিয়েছেন যেখান থেকে তিনি তরতরিয়ে উঁচুতে পৌঁছেছেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পারি, আমার বাবা তাঁদের কাছে কেন এত প্রিয়। মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সততা ও সাধুতার প্রতীক। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিই ছিল তাঁর অঙ্গীকার। বহু প্রকল্প শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেও বাণিজ্যিক লেনদেন লিখিত না রাখার অভ্যাস ছিল তাঁর। এসবই প্রমাণ করে যে, কেবল অন্যরাই সেখ আকবর হোসেনের ওপর ভরসা করতেন, তা নয়, তাঁরও গভীর আস্থা ছিল তাঁদের ওপর।' বড়োছেলে ছাড়াও স্ত্রী আনোয়ারা হোসেন, পুত্রবধূ ইঞ্জিনিয়ার মুরসালেন হোসেন, ছোটোছেলে সেখ আসিফ হোসেন প্রমুখরাই হোসেন-পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী।

চিকিৎসাবিদ্যা থেকে আটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ যেকোনো বিষয় নিয়ে গভীর পাঠাভ্যাস ছিল তাঁর। জাকুজিতে দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করা ছিল তাঁর একমাত্র অভিজাত শখ। আরও একটা শখ ছিল তাঁর, বিশ্বের বৃহৎ মহানগরীতে নিজের বাড়ি থাকা। ১৯৫৯-এ উত্তর লন্ডনের ফ্রিঞ্চলি কেন্দ্র থেকে প্রথম বারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (১৯২৫—২০১৩)। তরুণ আকবর হোসেনের শখ হল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বসবাসের কাছাকাছি তিনিও বাস করবেন। তাই-ই হল। কিন্তু এসবের বাইরে তিনি ছিলেন নিখাদ বাঙালি, অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনজন।

১৯৬৫-তে দেশত্যাগ এবং পরবর্তী কালে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও ভুলে যাননি তাঁর ছেড়ে যাওয়া নিজের গ্রামকে। ১৯৮০ থেকেই তিনি নিজের এলাকার উন্নয়নে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। এলাকার দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাঁরই দেওয়া জমিতে গড়ে উঠেছে। নিজে গড়ে তুলেছেন আহাদ খোদেজা স্মৃতি দাতব্য নিকেতন নামে একটি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র, যেখানে প্রায় প্রতিদিন আড়াইশো জনের বেশি রোগী চিকিৎসার সুবিধা পান। এ ছাড়াও এলাকার অভাবী মেধাবীদের পড়াশোনার জন্য এবং গরিবদের জন্য মাসিক স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে জন্মভূমির ঋণ শোধের প্রচেষ্টা উল্লেখনীয়। এলাকার ইদগাহ্ ও মসজিদের জন্যও তাঁর অবদান উনসানির মানুষ ভুলতে পারবেন না। আশির দশকে হাওড়ার অখ্যাত গ্রাম খলতপুরে আল-আমীন মিশন নামে এক শিক্ষাবিপ্লবের জন্ম হয়। ক্রমে রাজ্যের প্রায় সব সচেতন মানুষ এই মিশনের পাশে আসা শুরু করেন। আকবর হোসেনও সেভাবেই আল-আমীনের নাম শুনেছেন।

আসুন, শুনি মিশন নিয়ে তাঁর কথা, 'দেখুন, মিশনের সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। এখানে। তার আগে টেলিফোনে। ভদ্রলোকের স্বপ্ন বিরাট এবং সেই স্বপ্নে কোনো খাদ নেই।' নিজে মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাই প্রথম যে-বার মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে যান, মিশনের মেধাবীদের সান্নিধ্য পেয়ে বলেন, 'এবার তো আমি নিজে খলতপুরে গেলাম। মনে হল, আমার স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি। নিজে ভালো ছাত্র ছিলাম, কিন্তু একসঙ্গে এত এত ভালো ছেলে-মেয়ে, এই রেজাল্ট, মুসলমান সমাজের মধ্যে এ-জীবনে কোথাও দেখব, ভাবতেও পারিনি।'

তাই যা হবার তা-ই হল। মেধাবী ছাত্র, ব্যাবসায় দুনিয়াজোড়া সফল লন্ডনপ্রবাসী আকবর হোসেন সময় পেলেই তাঁর নিজ গাঁ খলিসানির পাশাপাশি খলতপুরেও নিয়মিত হাজির হন। সময়াভাবে সব সময় সশরীরে না হলেও আল-আমীন নিয়ে নিয়মিত চিন্তা-ভাবনা শুধু নয়, এগিয়ে এসেছেন মিশনের এই মিছিলে সামিল হতে। তাঁরই সহযোগিতায় একাদশ, দ্বাদশ ও জয়েন্টের পড়ুয়াদের জন্য আল-আমীন মিশন একাডেমি, খলিসানি ও সরকার অনুমোদিত প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য অনাবাসিক আল-আমীন মিশন স্কুল, খলিসানি মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান। ৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে তাঁর দেওয়া সাড়ে ছয় বিঘে জমিতেই উভয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অতি শৈশবে মায়ের মৃত্যুর বেদনা আকবর হোসেন এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেননি। সেই স্মৃতিতে খলিসানিতে তিনি একটি আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বরাবরই দেখতেন। আল-আমীনকে পাশে পেয়ে তিনি অতি দ্রুত এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। হাসপাতাল নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার না, সেটা হবে এখানকার মানুষের হাসপাতাল। পরিচালনা করবে আল-আমীন মিশন। সেটাই হবে আল-আমীনের মেডিকেল কলেজ।' মানুষের সব ভাবনা রূপ পায় না। কিছু থেকেই যায় অধরা। হাসপাতাল আকবর হোসেনেরও সেরকম স্বপ্নই রয়ে গেল। কারণ, তিনি গত ৩১ মে স্থানীয় সময় রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটে দুবাইয়ের এক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। উত্তরসূরিরা তাঁর এই মহৎ স্বপ্নের বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যের চূড়ায় পৌঁছেও তিনি ছিলেন মাটির মানুষ। দেশ ও সমাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই মহৎ মানুষের প্রয়াণ অন্য অনেকের সঙ্গে আল-আমীন মিশন পরিবারের জন্য অতি বেদনার। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এই শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে তাই বলেছেন, 'আল-আমীন মিশন পরিবারের এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর চিরবিদায় বিশেষ করে সংখ্যালঘু সমাজের জন্য বড়ো ক্ষতি। তিনি শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, দুনিয়াজুড়ে তাঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। মিশনের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং শিক্ষার নানারকম পরিবর্তন ও প্রয়োগের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন।'

'আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমি এমন সব মানুষের ফোন পেয়েছি, যাঁদের সঙ্গে গত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং অনেককেই আমরা জানি না, চিনি না। প্রত্যাশিত সমবেদনা ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে আমাদের আলাপের প্রসঙ্গটি স্মরণ করায় যে, আমার বাবা কীভাবে তাঁদের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন। একজন অভিভাবক, একজন বন্ধু, একজন ভাই, একজন পিতার মতো এবং সাধারণভাবে এক দয়ালু সাহায্যকারী হিসেবেই তিনি এইসব করেছেন। এক ঘণ্টা কিংবা পঁচাত্তর বছর ধরে আপনি তাঁর পরিচিত কি না, এটা কোনো ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তাঁর সহায়তা প্রদানে এসব নিয়ে দ্বিধা করতেন না তিনি। এটাই ছিল স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবানহুতালার জন্য তাঁর ইবাদত।' পিতার স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে এটাই পুত্রের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও। এবং অবশ্যই আমাদেরও। ■

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। শুরু হল বঙ্গদর্শন।

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

দ্বিতীয় কিস্তি

অশোককুমার কুণ্ডু

হলুদ জলে ভাসে দেবীর মুখ, ভাসন্ত মালসায় 'সময়'

স্নেহের মা,
কলকাতায় আমাদের ঘরে শরৎ এনেছে সুসময়, ডালায় ভরে। বেশি বেশি সুসময়। সুসময় এলেই বড়ো ভয় করে। ও সে করপাত্রে জল। মুহূর্তে ঝরে যায়। দুঃসময়ের রাত্রি নাকি দীর্ঘ, দীর্ঘতর এবং দীর্ঘতম। তুমি এ-বাড়িতে এলে তোমায় পড়ে শোনাব রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের সময় নিয়ে কথনীয় স্মরণ। কবি এবং বিজ্ঞানী দুজনেই তখন দর্শনশাস্ত্রের মগডালে।

আমাদের নগরগৃহের সুসমাচার তোমায় দিয়ে, আমি পথে নামব। নাহ্, বেশি দূরে যাব না। পারবও না। ট্যাঁকে নেই মুদ্রা। বাঙালির মেরুদণ্ড আমার, বর্তমানে সে ব্যথা দিয়ে কাঁদাচ্ছে। একজোড়া হাঁটু, তারাও যাবে নার জেদ ধরেছে। আমি বিনত, করজোড়ে বাপ-বাছা করে বললাম, আমাদের কন্যাকে বঙ্গদর্শনের গল্প শোনাতে হবে। তা না হলে সে অভিমান করে আসবে না কাছে। মেরুদণ্ড, জানু তোমরা কৃপা করো হে। এই তো, তোমাদের কথাও লিখছি। তোমাদের এতদিনের যন্ত্রণাহীন যে-সেবা আমায় দিয়েছ, তার কথাও তো কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। তোমরা আমার শরীর ধরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ পরিক্রমা পারি না। হাঁটু বললে, আলবাত যাব। শিরদাঁড়া বললে, চলো তবে ত্বরা করি। কিন্তু আমাদের দিয়ে বেশি খাটিয়ো না।

আমি কইনু, সে তো নিশ্চয়। ওখানে আমার বন্ধু মিহির আলু (পদবি) আছে না। ওর আছে তিন চাকার যান। না না, অটো-টোটো নয়। ভ্যানরিকশা। আমার প্রিয়তম যান। কেন? ওতে বসে দশদিক দেখা যায়। তাই। অন্য যান তো সোনার খাঁচা। মিহির সব ঘুরিয়ে দেখাবে। ওর বউয়ের কাছে নাস্তা— গরমাগরম মুড়ি ভেজে দেবে, মোটা চালের। তাতে থাকবে কুসুমবীজ ও ছোলা— বালিতে ভাজা। ওর বাচ্চাদুটো আমার কাঁধে-কোলে চড়ে আমাকে ব্যস্ত করে তুলবে। সদ্য পড়া ছড়া শোনাবে। কলকাতার রূপকথা শুনতে চেয়ে জেদ ধরবে সাঁজবিহানে, আমার কাছে। এইসব দেখেশুনে মিহির আলুর বউ প্রতিমা হাসবে মরমে। ডালে ফোড়ন দেবে ঠিকই, কিন্তু নুন দিতে ভুলে যাবে। আর তাই নিয়ে মিহির গজগজ করবে।

ওই গ্রামে গেলে চার-পাঁচ দিন লেগে যায় নগরে ফিরতে। কারণ? পায়ে পায়ে মায়ার শিকলি। যার কাছেই না যাই, তারই হবে অভিমান। তাই সব সংসারেই নিদেন এক বেলা চান-ভাত। অথবা একটা গোটা রাত। দিনের বেলায় আমায় কেউ আটকাতে পারবে না। মিহির আলুর চলন্ত ভ্যান, বসুন্তি আমি। পোড়ামাটির মন্দির দেখব। রাজবল্লভী দেবীর বিচিত্র গড়নের মূর্তি দেখব। দেখব গ্রামের আটচালা, বাংলা গড়নের। দেখব গ্রামের সকল দিঘি। বসব তার পাড়ে। নির্মল জলে সাঁঝের আকাশ দেখব। দিনের আকাশও। দিঘির জল তো নয়, পারফেক্ট লুকিং গ্লাস।

যাব তরুণ সজ্জন সুকুমার দাসেদের বাড়ি। ওরা তন্তুবায়ী। গাঁয়ে বলে তাঁতি। ওর বাবা গোপালচন্দ্র। গোপালবাবুর স্ত্রী অলকা দেবী। সুন্দর ঝিঙেপোস্ত আর বিউলির ডাল, যাকে বলে কড়াইয়ের (কলাই) ডাল বানায়। ফোড়ন যখন দেয় না! দু-মাইল দূর থেকে গন্ধে পেটের খিদে বাঘ ডাকে। অনেক দিন পরে যাচ্ছি তো, ওই পরিবারের বুড়িঠাকুমা নন্দরানি কি বেঁচে আছেন এখন? ওঁর হাতের চালতার অম্বল, গোটা গোটা রাইসরষের ফোড়ন! স্মৃতি বড়োই মধুর। স্মৃতি বড্ড কাঁদায়। সিপিয়া রং ধরে। ডাউন দ্য মেমারি লেন টপকে আসে কথকতা। কত্ত কথা।

আর আছেন আশি ছুঁই-ছুঁই নিশীথ মাস্টার। ফতুয়ার পকেটে যাঁর ওই গোটা দিগরের তথ্যভাণ্ডার। ওঁর ঘরে ব্রেকফাস্ট। দই-কলা-চিঁড়ে-মুড়ির সাপটা ফলার। গেট খুলে দেখতে পাব, নিশীথ স্যার জার্সি গোরুর দুধ দোহন করছেন। গাভীটি তার বাচ্চাকে আদর করতে করতে, গেট খোলার শব্দে মুখ তুলে বলবে, 'হাম্বা, হাম্বা, এতদিন পরে মনে

মিহির আলুর চলন্ত ভ্যান, বসুন্তি আমি। পোড়ামাটির মন্দির দেখব। রাজবল্লভী দেবীর বিচিত্র গড়নের মূর্তি দেখব। দেখব গ্রামের আটচালা, বাংলা গড়নের।

সেদিনের রাজবলহাট।

পড়ল বুঝি?' ওর ব্যাচ্চাটি মাথা নেড়ে, 'হুঁ, হা ওম্মা, এলে যদি বোসো তবে দাদু। সাঁঝবিহানে তোমার কলকাতার গল্প শুনব। তোমাদের শহরে শুনি তো মেলা মানুষ গিজগিজ করে।' আমি মাথা নেড়ে বলব, না গো নাতনি, কলিকাতায় মানহুঁস আর কোথায়? তারা ষণ্ডা ষণ্ডা গোরু। তবে তোমাদের মতন তারা ভদ্র নয়। সকলেই অবিশ্যি এমন না।

রাজবলহাট গ্রামে যাব আর পড়শিগ্রাম আঁটপুরে যাব না, তা তো হয় না। রামকৃষ্ণদেব আর মা সারদা দেবীর একান্ত স্নেহের, স্বামী প্রেমানন্দজি ওরফে বাবুরামের ভিটে দেখব না, তাও হয় নাকি? ওখানে রামকৃষ্ণ মিশনে দুপুরে পাত পেতে মাধুকরী— অপূর্ব শুদ্ধ স্বাদ তার। কোথায় পালায় কালিয়া-কোপ্তা-বিরিয়ানি। মহারাজকে একবার ফোনে প্রণাম। পৌঁছে গিয়ে সশরীরে প্রণাম। প্রাণ ভরে, মন ভরে, চোখ ভরে গোগ্রাসে দেখব। হিয়ায় ধরে রাখব। সব কথা লিখে জানাব তোমায়, রিখিয়া।

না বাপু। গল্পদাদুর লেখা হচ্ছে। শুরুতে এত দীর্ঘ কালোয়াতি বচন কেন? ক্লাসিক্যাল চালের গলা সাধলে, রিখি তুমি এ-লেখা 'বাং' করে দেবে। তাই আর ভূমিকা নয়। অবশ্য আমার কাছে সবটাই সুরসপ্তক। গানের শুরুতে গলা গরম অথবা তারে সুর বাঁধা— এ-দুটোই দেখার ও শোনার। তাই একটু বেশি বকে মরলাম।

এই পত্রের শুরুর শুরুয়াতে কয়েছিলাম, আমাদের নগরগৃহের সুসমাচারের কথা। সেইটি পাঁচ ছত্র কয়ে দিই। গাছটি ছিল টবে। নগরে জমি তো কাঠায়। অবাক লেগেছিল, প্রথম নাগরিক জীবনে তা শুনে। গাঁঘরে আমাদের বসত, আবাদি, ডাঙা, গোয়াল সবেরই হিসেব ছিল বিঘেতে। তা এই দু-কাঠার কলকাতার ভিটেতে, টবে টবে সুন্দরের আরাধনা। খরিদ করা ঝুরো মাটির টবে সভ্যতা বনসাই, তাই-ই হয়। তবুও নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো। ওই টবের গাছটি বহুদিন বন্ধ্যা। শুরুতে অবিশ্যি বেশ ক-টা ফুল দিয়েছিল, তারপরে বিপর্যয়। খিয়া, তোমার প্রিয় হুলো আর মিনির দাম্পত্য কলহে উলটে পড়ল টব। গাছের হাত-পা ভাঙল। শীর্ষমুকুলে হল স্ট্রোক। দু-বছর ধরে তার পরিচর্যা করে, বউমা তাকে বাঁচালেন। কাল সূর্যাস্তের পরে গভীর থেকে গভীরতর আঁধারে খুলল একটি একটি করে পাপড়ি। আজ সকালে তার অভিমানে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। এ-ফুলের নাম নাইট কুইন, রাত কি রানি। আমি ওকে ডাকি অভিসারিকা। বউমার সংসারে ফুল ফোটার পরব লেগেছে এখন। পাড়াপ্রতিবেশীরা দেখতে এসেছিলেন।

আমরা অবশ্য কুকুর-বিড়ালদের ঘরে ঢোকাই না। বিছানাতেও তুলি না। তুমি অবশ্য এ-তথ্যে দুঃখ পাবে, হয়তো আঘাতও। আমাদের ঘরের সামনে পাঁচ সারমেয়র বাস। দুটি সারমেয়ী। তিনটি সারমেয়। দুই সারমেয়ী বাচ্চা দিয়েছে। সাদা সাহেবিটার চারটে। বোস্টমি, তার আবার কপালে সাদা তিলক। সে বড্ড হিংসুটে। তার তিন বাচ্চা। আমাদের বাগানের দু-প্রান্তে দুজনের সংসার। প্রতিবেশী এক তরুণী, সে বোধ হয় কলেজে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দুটো সংসারের দেখভাল করছে। কাগজের কার্টুন, বাতিল কাপড় এনে বিছানা পেতে দিয়েছে। বউমা ওদের জন্য খাবার বানিয়ে দেন নিত্যরোজ। এখন পরিমাণে বেশি ও বিবিধ অনুপান। কারণটা কী? ওরা তো মা হয়েছে। ওদের বক্ষসুধায় সন্তান পুষ্ট হয়, তাই খাবারের পরিমাণ বেশি ও স্বাদ ভালো হওয়া চাই। মা পুষ্ট তো জগৎ পুষ্ট।

বাচ্চাগুলো কুঁই কুঁই আর টানা ঘুম। এখনও চোখ ফোটেনি। চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আসছে। মা মুখে করে নিরাপদ কাগজের বাক্সে। রাত গাঢ় হলে, ভোরের শীতে, মাতৃ ওমের ভিতর থেকে ওদের ক্ষীণ শব্দে আমি জেগে উঠি। টর্চের আলো ফেলি। চিৎকার করে ওঠে বোস্টমি ও সাহেবি। আমি গলার শব্দে সাড়া দিই। ওরা চুপ করে যায় মাতৃ-সতর্কতায়, তা রাষ্ট্র-মিসাইলের থেকে কম না। জীবনের কী গূঢ় রহস্য, অপার মায়া। বোস্টমির আদুরে ডাক, ঘাউ-উ করে বলে, 'ভোরের বাসে যাচ্ছ যাও, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।' আমার কাঁধের রুকস্যাক দেখে সাহেবি লেজ নাড়ে, 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে ওঠে। আমি বাইরের পথ ধরি।

শুনেছি সব পথই রোমে যায়। তা হবে। রাজবলহাট (এটি একটি গ্রামনাম) যাব। পথ তো তিনটে। দু-দুটো গতিময় পথের কথা অগ্রে বলি। ধর্মতলা থেকে কালেভদ্রে এক্সপ্রেস। তার কথা থাক। সে মেলা ভজকট। কোথায় একটা নেমে আবার ভিন্ন বাস। নাহ্, ওটা বাতিল। হাওড়া ময়দান থেকে এক্সপ্রেস। নামেই এক্সপ্রেস। গঞ্জের দুয়ার থেকে যাত্রী ওঠাবে। অন্যায় কিছু দেখি না। দেরিতে দেরিতে মাত্র ক-খানা বাস চলে। মানুষকে তো যেতে হবে, নাকি? এই বাস আমার মনপসন্দ। অনেক গেরস্তি মানুষ ওঠে। দেখি-শুনি তাদের কথোপকথনের চালচিত্র। যুবতি বউটি মোবাইল কানে দিয়ে দূরভাষে স্বামীকে মৃদু গঞ্জনা দিল। এই পথটি আমার লোভনীয়। কারণ? এই পথে পড়বে গজারমোড়। প্রধান পাক্কি সড়ক ধরে বাঁয়ে মোড় নেবে। এটিই গজারমোড়। তবে গজা মেলে না। বাস এখানে দম নেয়। ওই ফাঁকে কোনার দোকান থেকে নিয়ে

রাজবলহাট গ্রামে যাব আর পড়শিগ্রাম আঁটপুরে যাব না, তা তো হয় না। রামকৃষ্ণদেব আর মা সারদা দেবীর একান্ত স্নেহের, স্বামী প্রেমানন্দজি ওরফে বাবুরামের ভিটে দেখব না, তাও হয় নাকি? ওখানে রামকৃষ্ণ মিশনে দুপুরে পাত পেতে মাধুকরী— অপূর্ব শুদ্ধ স্বাদ তার।

নেব মাখাসন্দেশ। শাল পাতার মোড়কে। অপূর্ব সোয়াদ। পেটে গেলে তিনজন্মের স্মৃতি, জ্যান্ত জিয়োল মাছ। আরও একটা পথ আছে। সেটিতে বুড়ো কোমর-হাঁটুতে দরদ কম হবে। হাওড়া টু হরিপাল ট্রেনে। এখান থেকে মেলা বাস-ট্রেকার। রাজবলহাট।

স্মৃতির সরণি বেয়ে খিয়া, এখনও সে-পথে আমি যাই, গেছি কত্ত বার কল্পনায়। তোমার ঠাকুরদার মুখে শোনা গল্প। হাওড়া ময়দান থেকে ছোটো লাইনের মার্টিন ট্রেন। তোমার ঠাকুরদা আসতেন একদল যাত্রীর

অনন্ত বিষাদে মুক্তির খোঁজে সে দৌড়োয়।

সঙ্গে মুড়ি বেঁধে। পথে পড়ত তিনটে নদী। আরামবাগের দ্বারকেশ্বর, তার পরে মুণ্ডেশ্বরী, তার পরে বর্ধমানের দুখ— দামোদর। কাছেই চাঁপাডাঙা। 'চাঁপাডাঙার বৌ'— তারাশঙ্করের সেকালের খ্যাতনামা উপন্যাস। এখান থেকে ওই ট্রেনে তোমার ঠাকুরদা আসতেন হাওড়ায়। তারপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তুমি তো এলে না। সরি, আসতে পারলে না তার কাছে, তোমার বাপের জন্মভিটেতে। এলে শুনতে পেতে ওই মার্টিন কোম্পানির হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়েযাত্রার কত কত গপ্পো। মানুষটি চলে গেছেন শেষ ট্রেনে। তাহলেও তাঁর গল্পটা আমার পিতার মুখ থেকে শোনা, তোমায় শুনিয়ে দিই। এই রিখি, ও রিয়া, ও খিয়া, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? যা! ট্রেনের গল্পটা শুনে নে। আমার স্মৃতির মন্দগতির ট্রেনে, আমি চলে গেলে, কে তোকে শোনাবে আর? গুগুল জ্যাঠাও না, শ্রীময়ী রাওলিংও না।

সে-ট্রেন চলত জনজীবনের সঙ্গেই ছন্দ মিলিয়ে ধীরে, ধীর লয়ে। বৈঠকি চালে। দুয়ার থেকে যাত্রী হাঁক পেড়ে ট্রেন থামাত। রাস্তার আম গাছে পাকা আম পড়ে থাকত তলা বিছিয়ে। ড্রাইভারবাবু কুড়োত। যাত্রীরাও। টিকিট কাটলে চেকারবাবু রাগ করত। উপরি পাবে কেমন করে? লাইন টপকে মাঠের গোরুদের পার হওয়া, দাঁড়িয়ে পড়ত ট্রেন। এঞ্জিন রাগে ফোঁস ফোঁস ফোঁস গজরাত। এঞ্জিনের কয়লার কোলম্যানের বউ দুপুরের খাবার দিয়ে যেত মাঝমাঠে। কোলম্যান দু-চাঙড় কয়লাও ফেলে দিত সংসারের জন্য। বউটি ড্রাইভার-টিকিটবাবুর জন্য আলাদা ভরনের (কাংস পাত্র) বাটিতে ঘুসো চিংড়ির সঙ্গে সরু করে কাটা আলু, সরষেবাটার তরকারি দিয়ে যেত। ড্রাইভার-কোলম্যান-টিকিট চেকার সব যেন বাঁধা পড়ত ধীর গতির সারপেন্ট লেনে। ড্রাইভার দরজার পাশে মুখ বাড়িয়ে বলত, 'তোর কত্তার শেষের ট্রেনে ডিউটি দিয়ে ফিরতে রাত হবে।' বউটি ঘোমটার ভিতর থেকে ফিক করে বলত, 'মুখপোড়া মিনসে।' কু কু কু। ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস। চলে যেত ট্রেন। 'মা, বাপের আজ রাত হবে?' 'না না। ও তোর ডেরাইভার জেঠা এমনি বলল।' মায়ের হাত ধরে বাচ্চা কিশোরটি মেঠোপথে মিলিয়ে গেল।

তা সেবার মাঝপথে ট্রেনের এঞ্জিন গেল বিগড়ে। ড্রাইভার স্ক্রু-কবজা-হাতুড়ি-প্লায়ারস নিয়ে নেমে পড়ল। এক বুড়ি ঝাঁকায় সবজি আলু শসা নিয়ে বেচতে যেত দূরের হাটে। ফি-হাটেই যায়। যাত্রী-ড্রাইভার-চেকার সকলেরই চেনা। চেকারকে কলাটা-মুলোটা দেয় মাগনা। টিকিট তো কাটে না। বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে ঝাঁকা মাথায় নিয়ে বুড়ি নেমে গেল। ট্রেন লাইনের সমান্তরাল পথে তার যাত্রা। কিছু পরে ট্রেন মেরামতি করে চলতে শুরু করেছে। তখন বুড়িটাও অনেকটা পথ পার হল। ট্রেনটা এসে, বুড়ির কাছাকাছি থামল ফোঁস ফোঁস করে। ড্রাইভার দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ও বুড়ি, ও মাসি উঠে পড়ো।' বুড়ি মৃদু ঝাঁঝে বলল, 'আজ আমার বড্ড তাড়া আছে। তুমি চলে যাও বাপু দুগ্গা দুগ্গা করে।'

রাজবলহাট। হাট একটা আছে অবিশ্যি গ্রামেই, এই নামে। তবে গ্রামটি নিয়ে আছে সুন্দর একটা ছড়া। একটি জনপদের টপোগ্রাফও বলতে পারো। একটি প্রাথমিক গণবিন্যাস ধরা পড়ে তাতে। রিখিয়া, তুমি হয়তো, হয়তো বলতে পার, এ-ছড়া তৈরি কোনো একজন নিরক্ষর গাঁওবুড়ো বা বুড়ির। আমি বলি, তা তো এক্কেবারেই ঠিক। কিন্তু আমাদের এই ঝলমলে সাহিত্য-শিল্প-বাণিজ্য এবং সভ্যতার বর্ণপরিচয় আজিও রয়ে গেছে ওই নিরক্ষরদের বটুয়ায়। উত্তরসূরিদের, পূর্বসূরিদের মান্য দেওয়া উচিত। কৃতজ্ঞতা থাকাও দরকার। অহং নিয়ে মাতলে, মাতলার বিধ্বংসী বন্যায় ডুবে যাবে সব। পড়ে রবে ভূমি 'পরে শব।

'চার চক, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট, /এই নিয়ে রাজবলহাট।'— গ্রামনাম নিয়ে প্রয়াত, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের সুখপাঠ্য গ্রন্থ আছে। আর গ্রামঘুরনি, হাঁটাপথের গবেষক, আমার মুর্শিদ, প্রয়াত তারাপদ সাঁতরা মশায়ের আছে ছড়া-প্রবাদে গ্রামনাম। ছড়া-প্রবাদ দিয়ে গ্রাম সম্পর্কে অনেক তথ্য মিলত প্রাথমিকভাবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ চারটে চক: দফরচক, সখর (সুখের?)-চক, বৃন্দাবনচক। চক হল গিয়ে পুরোনো দিনের মাপ। ছোট্ট জনবসতি যেমন তোমাদের চাঁদনিচক। সম্ভবত ফারসি শব্দ। আর চোদ্দো পাড়া: নন্দীপাড়া, দেপাড়া, মনসাতলা, শীলবাটী, ভড়পাড়া, উত্তরপাড়া ...। এর মধ্যে কিছু পদবি ধরে পাড়া। মানে, সেইটুকু জনবিন্যাসে, যেমন দে পদবিধারীরাই মূল। তিন ঘাট: দিঘিরঘাট, মায়ের (রাজবল্লভী)-ঘাট এবং বাবুরঘাট।

পুরোনো দিনের জমিদার, সামন্ত প্রভুরা শুধুই শোষণ করেননি। গ্রামের পুঁজিতে গ্রাম গড়েছিলেন এবং গ্রামের পুঁজি গ্রামেই খাটত বেশি। পরে পরে নিষ্কর্মা জমিদারনন্দনরা, কলির কেতায় বসে বুলবুলি

বাংলার টেরাকোটা। রাধাগোবিন্দজিউর বিখ্যাত মন্দির। আঁটপুর, হুগলি।

উড়িয়েছে। পুরোনো দিনে বড়ো বড়ো দিঘি কাটাত জমিদার-সামন্তরা। সে-জলে কৃষিকাব্য ফলত। দু-একটি দিঘি থাকত পানীয় জলের তরে। দেবদেবীর নামে। তা কেউ নোংরা করত না। ছড়ার ভিতরে দেখতে পাবে দফর আর বদু শব্দ— বাঙালি মুসলমান নাম। গ্রামের জনবিন্যাসে মুসলমানপাড়াও থাকত বই কী। পচা, মধ্যরাত্রির খণ্ড, গ্রামিত স্বাধীনতার কিছু আগে-পরের থেকে শুরু হল ফাটল, জোড়-বেজোড়ের রক্তাক্ত খেলা। আজও চলছে। মনে পড়ে গেল, স্কুলপাঠ্যের ইংরেজি প্রবাদ— God created village and man made town। স্মৃতি থেকে লিখলাম। ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাজবলহাটের সে-যুগের একগুচ্ছ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, পরে কলকাতায় বাস। কিন্তু নিয়মিত গ্রামের সঙ্গে সংযোগ। আবার এই গ্রামের শীল আর ভড় পদবির মানুষেরা বেশ ধনী। ভড় পদবির ফকিরচন্দ্র ভড় ও জহরলাল ভড় এ-গ্রাম থেকেই শুরু করেছিলেন দেশজ প্রথার কুটীরশিল্প। যা দুলালের তালমিছরি। 'নাম ও সই দেখে নেবেন'— এই জেদে দ্বিতীয় প্রজন্মেই বাঙালির ব্যাবসা, মোকদ্দমায় থরহরি। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। ব্যাবসাটা অবিশ্যি গুটোয়নি। এঁদের আর্থিক দান গ্রামের জন্য প্রশংসার। যদিও এঁদের বংশের সকলেই প্রায় কলকাতায়।

রাজবলহাটের পাঠাগার ও অমূল্য (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-স্মৃতিতে) প্রত্নশালা— দুটোই ধুঁকে মরছে। প্রত্নশালার অমূল্য সংগ্রহ, নব সভ্যতার অবিবেচনায় পোকায় খেল। পাঠাগারের গ্রন্থগুলি নিজেরাই পা মুড়ে বসে। গ্রাহক সামান্য। গুগুল জ্যাঠার বৈঠকখানায় নব্য জ্ঞানীদের বিচরণ। আমি যে কতবার গেছি রাজবলহাটে। থেকেছি রাজার মতন।

ঠকাস ঠক। ঠক ঠকাস। মাকু, সুতোয় বাঁধা। সে ভাবে, আমি হয়তো এ-দিকে নয়তো ও-দিকে মুক্তি পাব। অনন্ত বিষাদে মুক্তির খোঁজে সে দৌড়োয়। টানা-পোড়েন। ঠাস বুননে গ্রন্থিত হয় রঙিন শাড়ি, পাড়ের নকশা। বালুচরি শাড়ি নিয়ে সমরেশ বসুর উপন্যাসের নামই 'টানা পোড়েন'। বাঁক্‌ড়োর একাধিক শব্দ ও বাক্য আছে। তুমি পড়বে নাকি? পরবে কি তুমি দশহাতি— তাঁতের জমা খোল, এক ঢাল, তার পাড়ে খেলা করে ময়ূর-ময়ূরী? নিশীথ স্যার একটা শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন তোমার জন্মদিনে। রেখেছি আমি। তুমি জিনস ছেড়ে, কালেভদ্রে পরবে কি শাড়ি? শাড়ি পরতে নিশ্চয়ই জান। জিনস পোরো ফেস্টে। পাইল-পরবে পারলে পোরো শাড়ি, মানাবে ভালো, মানবে হক্কলে।

এতবার কেন এই একই রাজবলহাট গ্রামে আসি? শুধিয়েছিল হরিপাল কলেজের এক তরুণী সুনন্দা, এ-গ্রামের বাসিন্দা। মায়ের সঙ্গে তাঁতে বসে শাড়ি বুনছিল সে। দুয়ারে ঠাকুমা-বুড়ি, চাঁদের বুড়ি, চরকায় সুতো কাটছিল। আমি তরুণীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, এ-গাঁয়ে আসি তোমাকে আর তোমার বুনন দেখতে। তার মা আর ঠাকুমা হেসে খুন। বর্ষা ছাড়া, বিশেষত শীত-গ্রীষ্মে এলে দেখতে পাবে কত রংবেরঙের সুতোর লাটাই উঠোনে, দুয়ারে গৃহসংলগ্ন পথে রোদ খাচ্ছে। গোটা গাঁ যেন হোলিতে মজেছে। দ্বিতীয় একটা নাম রেখেছি এই গাঁয়ের, কোমল গান্ধার নয়। রামধুন, রাজবলহাটের রামধনু গাঁ। হাটটা এখন জমজমাট। রোজ সকালের বাজার। হাট কাম বাজারে খুউব যাই পিঙ্কুর সঙ্গে। কৃষি ফসলের উপচে পড়ার ভিতরে বুঝতে পারি উন্নত এগ্রোটেক। আর মানসান্টের বিট-বীজ-মন্ত্রে আমার বুকে তরাস জাগে। আমার হাতে নেই এই ভুবনের ভার। ■

পরের সংখ্যায়

গত একতিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় উদ্যোগপতি

মোরশেদ আলি মোল্লা

এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগপতির গল্প

আসাদুল ইসলাম

'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগের প্রতিটা লেখা লিখতে গিয়ে আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠি। এই আনন্দ এক-একটা মানুষকে জানার এবং আপনাদের জানানোর। মানুষের জীবনকে জানার মতো আনন্দজনক বিষয় খুব কমই আছে মনে হয়। এক-একজন মানুষের জীবনে কত বাঁক, কত লড়াই, কত অজানা গল্প লুকিয়ে থাকে। এসবই যখন জানতে পারি তখনই অনির্বচনীয় এক অনুভূতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কখনো কখনো মনে হয় এ কী করে সম্ভব! কিন্তু জীবনই আমাদের জানিয়ে দেয় কী সম্ভব আর কী অসম্ভব, তা হিসেব করা মানুষের নাগালের বাইরে। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে প্রকাশিত প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জীবনকাহিনি, তাঁদের লড়াই-সাফল্য বৃত্তান্ত এ-কথাই প্রমান করেছে বার বার। এ-বারের উজ্জ্বল প্রাক্তনী মোরশেদ আলি মোল্লা। এই লেখাটা নানা কারণে ব্যতিক্রমী। সেটা কীরকম? আসুন ব্যাখ্যা দিই।

মোরশেদ আলি মোল্লা ডব্লিউবিসিএস অফিসার নন, ডাক্তার নন, ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপকও নন। মানে যেসব পেশার মানুষদের বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখে আমাদের সমাজ, সেসব কোনো পেশার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। তিনি ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী মানুষকে কি ডব্লিউবিসিএস অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপকদের সঙ্গে একই সারিতে বসানো যায়? এ-প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে একটা গল্প বলি আপনাদের। গল্পটা সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও কাজের হবে, যারা কেবল একটা চাকরি জোটানোকেই জীবনের পরমপ্রাপ্তি মনে করছে। গল্পটা পড়েছিলাম বছর পনেরো কী তারও আগে, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একটা লেখায়। দুই বন্ধু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ছেলে-মেয়েদের প্রতিষ্ঠার গল্প করছেন। একজন জানালেন তাঁর বিবাহিতা তিন মেয়ের মধ্যে ছোটোটির বর ইঞ্জিনিয়ার, মেজোটির বর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। এই দুই মেয়েকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। চিন্তা বড়োমেয়েকে নিয়ে। দ্বিতীয় বন্ধু চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বড়োর বর কী করে? ব্যাবসা করে জানার কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ছোটো, মেজোজামাই কোথায় চাকরি করেন? প্রশ্নের উত্তরে বন্ধু জানালেন বড়োজামাইয়ের কোম্পানিতে। এই হচ্ছে ব্যবসায়ী মানুষদের সম্পর্কে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের কর্মসংস্থান করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটা বড়ো বিষয় ঠিকই, কিন্তু তারচেয়েও বড়ো বিষয় নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারা। পৈতৃক ব্যাবসা ছাড়া মোরশেদের নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলা ব্যাবসায় প্রায় দেড়শো জন কাজ করেন। এটা অনেক বড়ো বিষয়, সেটা কি আর বলে দিতে হবে?

এ-বারের লেখাটার আর-একটি ব্যতিক্রমী দিক হল, এ-বার এমন

এ-বার এমন একজনকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, যিনি পড়াশোনায় তেমন তুখোড় নন। কিন্তু মানবিক উদারতায় তিনি অনেক তুখোড় ছাত্র-ছাত্রীকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন।

একজনকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, যিনি পড়াশোনায় তেমন তুখোড় নন। কিন্তু মানবিক উদারতায় তিনি অনেক তুখোড় ছাত্র-ছাত্রীকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন।

বিগত লেখাগুলিতে উজ্জ্বল প্রাক্তনী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে পেশা, পড়াশোনায় উজ্জ্বল ফল আর জীবনসংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ-বারের উজ্জ্বল প্রাক্তনীর পেশা ও ফল নিয়ে তো বললাম। জীবনসংগ্রাম বলতে সাধারণত আমরা ধরে নিই, আর্থিক অনটনের সঙ্গে যুঝে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু জীবনসংগ্রামের শুধু এরকম রূপই থাকে না। মানুষকে লড়তে হয় নানা প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে। আর্থিক অনটন যাদের নেই তাদের জীবনে কোনো সমস্যা নেই, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কোনো ছাত্র-ছাত্রীর লড়াই মানে শুধু তার একক লড়াই নয়, তার পরিবারেরও লড়াই। মোরশেদ আলি মোল্লাকে আর্থিক অনটনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়নি, কিন্তু তাঁর আব্বাকে লড়তে হয়েছিল এক অসম লড়াই। আমরা উজ্জ্বল প্রাক্তনীকে জানার সূত্রে তাঁর পরিবারের কথা তো জানিই। মোরশেদের কথা জানার জন্যই কেবল আমরা তাঁর আব্বা সোলেমান মোল্লা সাহেবের কথা জানব না। জানব আরও একটি কারণে। আল-আমীন মিশনকে, তার এগিয়ে যাওয়াকে যারা জানেন, তাঁদের প্রায় সকলেই শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের অবদানের কথা জানেন। মোস্তাক হোসেনের সঙ্গে আল-আমীন মিশনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মিশন প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর। প্রাক্-মোস্তাক হোসেন সময়ে আল-আমীন মিশনের পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সোলেমান মোল্লা। এই লেখায় আমরা জানব তাঁর সহযোগিতা ও আল-আমীন মিশনের নিজস্ব লড়াইয়ের কথাও। তাই এ-বারের উজ্জ্বল প্রাক্তনী শুধু এক ছাত্রের উজ্জ্বল হয়ে ওঠার গল্প নয়। এবার মূল গল্পে প্রবেশ করা যাক।

মোরশেদ আলি মোল্লার বাড়ি হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অঙ্কুরহাটি গ্রামে। হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রধান জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। ছোটো-বড়ো নানা শিল্প গড়ে উঠেছে এই জেলায়। কলকাতা ও হাওড়া শহর কাছাকাছি হওয়ার কারণে হাওড়ার গ্রামীণ এলাকাতেও ধীরে ধীরে নানা শিল্প বিস্তার লাভ করেছে। পাঁচলা থানা এলাকায় তৈরি হয় পরচুলা, দেউলপুরে পোলো খেলার বল, ব্যাডমিন্টনের শাটল কক তৈরি হয় উলুবেড়িয়া থানার বনিবন গ্রামে, তালা চাবি তৈরি হয় পাঁচলা জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড়ে। বাঁকড়া অঙ্কুরহাটি এলাকায় রেডিমেড পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এসবই বর্তমান হাওড়ার চিত্র। পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামীণ হাওড়ার এই চিত্র ছিল না। যদিও হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় একশো বছরেরও বেশি আগে জুট মিল, কটন মিল, জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল। শিল্পাঞ্চল লাগোয়া এলাকাগুলোয় বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠেছে ও উঠছে। সোনালি চতুর্ভুজ সড়ক যোজনায় গড়ে তোলা বোম্বে-মাদ্রাজ জাতীয় সড়ক জেলার অর্থনৈতিক বিকাশকে অনেক তরান্বিত করেছে। হাওড়া জেলার বহু মানুষ ছোটোখাটো ব্যাবসা ও হাতের কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করলেও গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও প্রধান ভরসা চাষবাস। এই জেলায় শহর ও গ্রাম-কেন্দ্রিক মানুষের বসবাস প্রায় অর্ধেক-অর্ধেক।

অঙ্কুরহাটি থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হওয়ার পর থেকে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। এইসব এলাকার উন্নয়নের চিত্র গত কুড়ি-তিরিশ বছরে দ্রুত বদলে গেছে। কিন্তু আগে ছিল গ্রামবাংলার অন্যান্য এলাকার মতোই। সেটা মোরশেদদের পারিবারিক ইতিহাস জানলেই খানিকটা বোঝা যাবে। মোরশেদের দাদাজি খুব সামান্য পড়াশোনা জানতেন। তাঁর জীবিকা ছিল চাষবাস। মোরশেদের আব্বার যখন দশ-বারো বছর বয়স তখন তিনি মারা যান। ফলে মায়ের হাত ধরে গিয়ে তাঁদের উঠতে হয় মামার বাড়িতে। মোরশেদের আব্বা, সোলেমান মোল্লা, তাঁর মামা কাদের গাজীর কাছে মানুষ হন। মানুষ হওয়া বলতে দিন গুজরান করা আর কী। মোরশেদের আব্বা সোলেমান মোল্লা মামাবাড়িতে এসে পড়াশোনা শুরু করলেও তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। কাদের সাহেব পোশাক তৈরির ব্যাবসা করতেন। তাঁর কাছে কাজে লেগে যান। তখন তাঁর বয়স বছর চোদ্দো-পনেরো হবে। অল্প দিনের মধ্যে কাজ শিখে নিজেই ওস্তাগারের থেকে কাজ এনে তৈরি করতে শুরু করেন। বছর চারেক পর তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের দু-বছরের মাথায় মোরশেদের আব্বা বাংলাদেশ চলে যান। সেখানে বছর চারেক গার্মেন্টসের ব্যাবসা করার পর দেশে ফিরে আসেন। এখানে মামার সহায়তায় ব্যাবসা শুরু করেন। কিন্তু ব্যাবসার চেয়ে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ানোতে বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েন। জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সঙ্গেও। এসব ১৯৭২-'৭৩ সালের কথা। সেই সময় উনি ডোমজুড় ব্লক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। হয়েছিলেন অঞ্চল প্রধানও। এইসব করতে গিয়ে নিজের গার্মেন্টস ব্যাবসা বা পরে করা রেশন দোকানও ঠিকমতো চালাতে পারেননি। তখনও মোরশেদের আব্বা নিজের সংসার নিয়ে থাকেন মামার বাড়িতেই। একটা থাকার ঘর আর একটা রান্নাঘরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন। ভাগ্যের চাকা ঘোরে মোরশেদ জন্মানোর পর। মোরশেদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭৭ সালে। পাঁচ ভাই, চার বোনের মধ্যে মোরশেদই ছোটো। কীভাবে ভাগ্যের চাকা ঘুরল সে-প্রসঙ্গে আসা যাক। সেই সময় ডোমজুড়ের বিধায়ক ছিলেন কংগ্রেস দলের কৃষ্ণপদ রায়। রাজনীতি করার সূত্রে তাঁর সঙ্গে যথেষ্টই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সোলেমান সাহেব। একদিন প্রশাসনিক কাজ মিটিয়ে দুজনে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের পাশ দিয়ে হাঁটছেন। একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে কৃষ্ণপদবাবু সোলেমান সাহেবকে বললেন, 'ওই জায়গাটা খাস জমি, লিজ করিয়ে দিচ্ছি, কিছু করুন।' কিছু দিন পর সেই জমিটা লিজ নেন। লিজ নিতে তিন হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে, দেনা করে সেই অর্থ জোগাড় করেছিলেন। লিজ তো নিলেন, কিন্তু জায়গাটাকে কাজে লাগাবেন কীভাবে? কাপড়ের হাট তখন চলছে পাশেই। ঠিক করলেন ওই জায়গাতেও কাপড়-ব্যবসায়ীদের জন্য হাট করবেন। কিন্তু ভাবলেই তো আর হল না, টাকা কোথায়! ঠিক করলেন দোকানঘর তৈরি করতে যে-অর্থ

লাগবে, তা সংগ্রহ করার জন্য অংশীদার নেবেন। কয়েক জনকে প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু কেউ রাজি হলেন না। কারণ, এলাকার মানুষের মনে তখন ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, তাঁকে দিয়ে ব্যাবসা হবে না। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে তিনি হাজির হলেন আল-আমীন মিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মহম্মদ আলি সাহেবের কাছে। তিনি অর্থবান মানুষ নানা ধরনের ব্যাবসা করেন। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁকে কুড়ি শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করে হাট গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন সোলেমান সাহেব। বাঁশের কাঠামো আর টিনের ছাউনি দিয়ে দোকানঘর তৈরি হল। হাওড়ার মঙ্গালাহাটের অন্যতম মডার্ন হাটের যাত্রা শুরু হয়েছিল এভাবেই। বর্তমানে ওই অঞ্চলে এগারোটি হাট চলে। একমাত্র মর্ডান হাট ছাড়া সবগুলোই মাড়োয়ারিদের। মডার্ন হাট কিন্তু প্রথম দিকে জমেনি। ১৯৮৩-'৮৪ সাল নাগাদ পাশের বড়ো হাট পুড়ে যায়। মডার্ন হাটে ক্রেতা-বিক্রেতারা ভিড় জমায় তখন থেকেই। আরও বছর খানেক পর বিল্ডিং তৈরি করার পারমিশন নিয়ে তিনতলা বিল্ডিং তৈরি করেন। এক বিঘা জমি জুড়ে বর্তমানে ছ-শো দোকান চলে মডার্ন হাটে। এটা শুধু মোরশেদ আলি বা তাঁর পরিবারের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম এক ব্যাবসায়িক কেন্দ্রের ইতিহাসও।

সোলেমান সাহেব হাটের স্থায়ী বিল্ডিং নির্মাণের আগেই সিমেন্ট সাপ্লাইয়ের ব্যাবসা শুরু করেন। তখন সিমেন্টের ব্যাবসা করার জন্য লাইসেন্স নিতে হত। অস্থায়ী দোকান বিক্রি করা অর্থ দিয়ে তিনি সিমেন্টের ব্যাবসা শুরু করেছিলেন। হাটের বিল্ডিং তৈরি করার পর তা বিক্রি করে যে-অর্থ পেলেন, তা দিয়ে ইটভাঁটা চালু করলেন। দুটো ইটভাঁটা গড়েছিলেন। নিজেদের বসতবাড়ির জায়গা ছিল না বলে বেশ কিছু জমিও কিনলেন। কিছুদিন রেলের ঠিকাদারের কাজও করেছিলেন। আর ১৯৯৪ সালে পেট্রল পাম্প শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোক হয়ে তিনি মারা যান। প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে তিনি ব্যাবসার বহরকে অকল্পনীয় উচ্চতায় তুলে নিয়ে যান। সোলেমান মোল্লার জীবনের গল্প অনেক বড়ো, কিন্তু ছোটো করতে হল এই কারণে যে, তিনি আমাদের আলোচ্য নন। মোরশেদ মোল্লার জীবনকে বুঝতে যতটুকু বলা দরকার, তা জানালাম। এবার আমরা ফিরে আসি মোরশেদের কথায়।

১৯৭৭ সালে মোরশেদ জন্মানোর পরই তাঁদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। পাঁচ-ছ বছর বয়সে মোরশেদ যখন প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনা শুরু করেন তখন পরিবারে স্বচ্ছলতা এসে গেছে। স্থানীয় একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক বছর পড়ার পর ভর্তি হন পাশের গ্রাম মাকড়দহের বামাসুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টি উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত। ভালো পড়াশোনা হয়। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে কিছু দিন ক্লাস করার পর আল-আমীন মিশনে ভর্তি হন মোরশেদ। সেটা ১৯৮৮ সাল। সেই সময় মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম দান-জাকাত সংগ্রহ করতে আসতেন অঙ্কুরহাটি এলাকায়। আসতেন ছোট্ট এম-৮০ মোটর সাইকেল চালিয়ে। মোরশেদের আব্বা সোলেমান সাহেব সহায়তা করার পাশাপাশি মিশন সম্পর্কে খোঁজ নেন। নুরুল ইসলাম মোরশেদকে ভর্তি করার কথা বললে একদিন মোরশেদকে সঙ্গে করে নিয়ে সোলেমান সাহেব খলতপুর যান। স্বাভাবিকভাবেই তখন মিশন এখনকার মতো বিশাল তো নয়ই, সাজানো-গোছানোও ছিল না। এখন রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে মিলে আল-আমীন মিশনের প্রায় ষাটটি শাখা। তখন, মোরশেদ যখন ভর্তি হন, মাদ্রাসা বিল্ডিঙে মাত্র চারটে রুম নিয়ে মিশন চলছে। সাধারণ সম্পাদকের বসার জায়গা ছিল চিলেকোঠার পাশে সামান্য একটা ঘরে, যেখানে চারজনের বেশি লোকের বসার সংকুলান হত না।

ছাত্র ছিল মাত্র ৭৩ জন। মিশন ঘুরিয়ে, মোরশেদের আব্বা মোরশেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'থাকতে পারবে?' ছোট্ট রোগা-পাতলা শ্যামলা ছেলেটা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ। তাঁকে রেখে আব্বা যখন বাড়ির পথে পা বাড়ালেন তখন শুরু হল কান্না। সোলেমান মোল্লারও হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। কারণ, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন মোরশেদই দারিদ্র্যমুক্ত জীবনের আগমনি বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন। আদরের সন্তান কষ্ট করে থাকতে পারবে কি না জানা নেই। মিশনের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক সকলেই চাইছিলেন মোরশেদ থাক। থাকলে আর্থিক সহায়তার বিষয়টা মজবুত হয়। তখন পূর্ণব্যয়ে পড়া ছাত্র কোথায়! শুধু পূর্ণব্যয়ে পড়াই তো নয়, অন্যান্য অনুদানের বিষয়ও জড়িয়ে ছিল। মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় সোলেমান মোল্লা যে-সহযোগিতা করেছিলেন, সেই সময়ের নিরিখে সেটা ছিল বেশ বড়ো মাপের। কীরকম একটু বলা যাক। চারটে বড়ো রুম নিয়ে তখন মিশন চলছে। পাশে আর-একটা গাঁথনি হয়ে পড়ে আছে। এদিকে ছাত্রও নিতে পারছেন না জায়গার অভাবে। সোলেমান মোল্লা টিনের ছাউনি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, যার ফলে নতুন করে ৩০ জন ছেলে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাসা বিল্ডিঙের এক দিকটা দোতলা হলেও এক দিকটা খানিকটা উঠে পড়ে ছিল। মোরশেদ মিশনে ভর্তি হওয়ার পরের বছর, তাঁর মামাতো ভাই রাশিদুলও ভর্তি হয়েছিলেন। ওই বছরই মোরশেদের আব্বা-মামাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা বিল্ডিঙের অসম্পূর্ণ অংশের ছাদ ঢালাই ও ফিনিশিঙের ব্যবস্থা করা হয়। মোরশেদের আব্বা জাকাতের টাকা যা দেওয়ার তা তো দিতেনই, তার বাইরে বিল্ডিঙের কাজে নিজের ভাঁটার ইট ও গোডাউনের সিমেন্ট দিয়েছেন। জাকাত সংগ্রহের কাজেও সহযোগিতা করেছেন। অঙ্কুরহাটির বিভিন্ন মানুষকে ধরার পাশাপাশি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের থেকেও অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মডার্ন হাটে যে ছ-শো দোকানদার আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের

> মোরশেদ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯৯৩ সালে। পেয়েছিলেন ৬৫ শতাংশ নম্বর। ওই ব্যাচের সকলেই প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে যেকোনো সাধারণ স্কুলের ভালো ছেলে-মেয়েরা মোরশেদের মতো ফল করত।

কাছে নিয়ে গিয়ে দান-জাকাত সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এরকমভাবেই বহু মানুষের সহযোগিতাতে আল-আমীন মিশন আজ আল-আমীন মিশন হতে পেরেছে। আল-আমীন মিশন সমাজের মানুষের দ্বারা সমাজের মানুষের জন্য গড়ে তোলা স্বপ্নপ্রতিষ্ঠান। কোনো একক মানুষের দ্বারা বড়ো কাজ করা কখনোই সম্ভব নয়। কোনো একক ব্যক্তির অবদানে নয়, যৌথ প্রচেষ্টায় আল-আমীন মিশন আজ গর্বের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

আবার ফিরে আসি মোরশেদের কথায়।

মোরশেদকে মিশনে রাখতে হবে। রাখার উপায় কী? ও কি মিশনের অতি সাধারণ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারবে? স্যারদের আর মিশনের সহপাঠীদের বোঝানোয় মোরশেদ মিশনে থেকে গিয়েছিলেন। কীভাবে? মোরশেদের ভাষাতেই বলি, 'প্রতি সপ্তায় আব্বা খাবার নিয়ে দেখা করতে যেতেন। সেই খাবার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতাম। প্রতিদিনের খাওয়ার ব্যাপারে বলি। তখন মিশনে ভালো খাওয়া-দাওয়া হত না। বেশিরভাগ দিন ভাত, ডাল, আলু। আলু রান্না, নয়তো আলুভর্তা। মাংস দু-পিস মানে বিরাট ব্যাপার। মাছ হলে সেটা হত সিলভারকাপ মাছ। ডিম হলে সেটা সেদ্ধ দেওয়া হত। সকালে বিকালে নাস্তা ছিল মুড়ি। ছোলা মুড়ি, চিনি মুড়ি। বিস্কুটও ছিল। এইসব খাবার খেয়েও মনে হত না মিশন ছেড়ে চলে যাই।

খাবার নিয়ে বন্ধুরা অনেক অভিযোগ করত। আমি কোনোদিন করিনি। শুধু তা-ই নয়। তখন মিশনে প্রত্যেক ছেলেকে টয়লেট পরিষ্কার করতে হত। আমায় স্যারেরা করতে দিতে চাইতেন না, তবু আমি করতাম। যখন ছোটো ছিলাম তখন স্যারেরা এটা-ওটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। আমরাও যখন বড়ো হলাম তখন মিশনে আসা নতুন ছেলেদের বোঝাতাম, মনখারাপ ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। আসলে ওইটুকু বয়সে বাড়ির সবাইকে ছেড়ে, চেনা জায়গা ছেড়ে থাকার কথা ভাবলেই মনখারাপ হয়ে যায়। কিছু দিন পর অবশ্য মনখারাপ কেটে যায়। তখন আমার মনে হয় থাকা-খাওয়ার সুবিধা-অসুবিধার চেয়েও মিশনের ছেলে-মেয়েরা বেশি বাঁধা পড়ে স্যার-ম্যাডামদের আর বন্ধুদের ভালোবাসার বাঁধনে। আমাকে তো মিশনের সকলেই খুব ভালোবাসতেন। সেক্রেটারি স্যার বহুদিন আমাকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়েছেন। আমার সাবান-তেল-তোয়ালে নিয়ে স্নান করেছেন। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক এই পর্যায়ে যে যেতে পারে, তা ভাবাই দুষ্কর আজকে।'

সেসময়ের কথা জানতে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বললাম। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখ। কয়েক মুহূর্ত থামলেন। বদলে গেল তাঁর চোখ-মুখের ভাষা। মনে হল, বুকের কষ্টরা ভিড় করেছে মুখে। তিনি কথা শুরু করলেন, 'সেসময় অনেক কষ্ট। মুষ্টির চাল সংগ্রহ করে মিশনের সংসার চালাই। মনে পড়ছে, সোলেমান মোল্লা সাহেব যখন মিশনে আসেন তখন গোলা মাটি দিয়ে ইটের উপর ইট সাজিয়ে দেয়াল তুলে দু-তিন কামরার ঘর বানিয়েছিলাম। সেই ঘরের দেয়াল বাঁকাচোরা হয়ে গিয়েছিল। সেটাও ছাইতে পারিনি। সোলেমান মোল্লা সাহেব সমস্ত টিন কিনে দিয়েছিলেন। প্রায় বারো হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল। তখন সেই টাকার মূল্য অনেক। আজ মিশন অনেক বড়ো জায়গায় গেছে। কিন্তু এমন মানুষরা পাশে না থাকলে সেটা হত না। এঁদের অবদান ভোলার নয়।' মোরশেদ প্রসঙ্গে বললেন, 'মোরশেদকে নিজের সন্তানের মতো করেই মিশনে রেখেছিলাম আমরা। মোরশেদ আজও সে-কথা মনে রেখেছে। এই যে মোবাইলটা ব্যবহার করছি, এটা ওঁরই দেওয়া। (মোবাইলটা তুলে দেখালেন। এসব কথা বলার মতো নয় বলেই হয়তো মোরশেদও এ-বিষয়টা কথা বলার সময় আমায় জানাননি।)। এটা বড়ো বিষয় নয়। বড়ো বিষয় হল, মোরশেদ যখন কথা বলে তখন সম্ভ্রমের সঙ্গে, আদবের সঙ্গে বলে। ব্যাবসায়িক সাফল্য তাকে বিনয়ের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। ওর জন্য আমরাও গর্ব অনুভব করি।' সেই সময়কার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মোরশেদও ভোলেননি। তিনি জানালেন, 'শুধু সেক্রেটারি স্যার কেন, অন্যান্য স্যারদের যে-হৃদ্যতা আমরা পেয়েছি, তা পরম পাওয়া বলে মনে হয়। শিক্ষককে বলা হয় সেকেন্ড প্যারেন্টস, সত্যিকার সেরকম ব্যবহার পেয়েছি আমরা মানস স্যারের থেকে। উনি ছাত্রদের নখ কেটে দিতেন। কতটা ভালোবাসা থাকলে এরকম করা যায়! মানস স্যার হলেন মিশনের দাদু ননীগোপাল চৌধুরীর ছেলে। এখন উনি খলতপুর হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মিশনে হিন্দু-মুসলমান টিচার ছিলেন বা এখনও আছেন। বড়ো বিষয় হল, বোঝা যেত না কে হিন্দু কে মুসলমান। মানস স্যার ছাড়াও ছিলেন হারাধন স্যার, স্বপন স্যার, কর্মকার স্যার, দিলীপ স্যার, প্রফুল্ল স্যার। সবাই ছাত্রদের খুব ভালোবাসতেন। ওঁদের ভালোবাসা ভোলার নয়।' স্মৃতির মুগ্ধতা খেলা করছিল মোরশেদের চোখে-মুখে। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, সেই সময়কার বিশেষ স্মৃতির কথা কিছু বলুন। 'স্মৃতি তো অনেক, দু-একটা বলছি।' মোরশেদ যখন আমাকে এই কথা বলছেন তখন দরজা ঠেলে ঢুকলেন মোমিনুর। মোমিনুর হলেন আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। মিশনের সুষ্ঠু পরিচালনার কাজে এরকম বেশ কিছু নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র নিয়োজিত আছেন, মোমিনুর তাঁদেরই একজন। মোমিনুরকে দেখিয়ে মোরশেদ আমাকে বললেন, 'এই তো এরা ভালো বলতে পারবে।' মোরশেদ-মোমিনুরের যৌথকথনে যে-কটা গল্প উঠে এল, তার থেকে সংক্ষেপে তিনটে আপনাদের জানাই। একটু আগেই অমুসলমান শিক্ষকদের ভালোবাসার কথা বলেছি। এবার আরও এক সম্প্রীতির কথা শোনালেন মোরশেদ। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ওই সময় মোরশেদ ক্লাস নাইনে পড়েন। গোটা দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সর্বত্র। মিশনে দূরদূরান্তের ছেলেরা পড়তে

> আব্বা মারা যাওয়ার পর সব ব্যাবসা দেখতে শুরু করেন তিনি। কাজের বহর কমাতে একটা ইটভাঁটা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় মোরশেদের ওপর। ভাঁটায় প্রায় ১৫০ জন কর্মচারী কাজ করেন। ব্যাবসায় নজর দিতে গিয়ে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

এসেছে। একটা উৎকণ্ঠা মিশনজুড়েও। সেই সময় মিশনে রাত্রিবাস করতে শুরু করলেন ননীগোপাল চৌধুরী। তিনি বললেন, 'কিছু হলে আগে আমার হবে তারপর তোদের।' যদিও খারাপ কিছু ঘটেনি। কিন্তু বিষয়টা মোরশেদের স্মৃতিতে থেকে গেছে। মোমিনুর ফুটবল খেলা নিয়ে একটা ঘটনা যোগ করলেন। উদয়নারায়ণপুর-আমতা জোনাল এরিয়ার স্কুলগুলো নিয়ে স্পোর্টস হত। ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হওয়া ঘোরাফেরা করত পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দির আর খিলা গোপীমোহন শিক্ষাসদন— এই দুটো স্কুলের মধ্যে। ওই দুই স্কুলকে হঠিয়ে দিয়ে খলতপুর হাই মাদ্রাসা ১৯৯২ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আর একবার হাওড়ার রাজাপুরে খেলতে গিয়ে ঝামেলা হওয়ার কথা বললেন মোরশেদ। বললেন, 'গোল করা নিয়ে বা অন্য কোনো বিষয়ে ঝামেলা হয়েছিল। মিশনের কয়েক জন ছেলেকে মেরেছিল। গোরাই স্যার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন এদিক-ওদিকে ভালোই খেলতে যাওয়া হত। সেক্রেটারি স্যার ওই ঘটনা শুনে ছেলেদের ডেকে সবার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে দেখেছিলেন লেগেছে কি না।' মোরশেদ এমনভাবে কথাটা বললেন যেন মনে হল, তাঁদের প্রিয় সেক্রেটারি স্যারের স্পর্শ এখনও গায়ে লেগে আছে। মোমিনুর বললেন, 'সেই সময়ের আর-একটা ঘটনার কথা লিখতে পারেন। সেই প্রথম বার টিভিতে মিশনকে নিয়ে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। কলকাতা দূরদর্শনে "ভালোবাসার মুখ" শিরোনামে একটা অনুষ্ঠান হত। প্রণবেশ সেন, উপেন তরফদার করতেন। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কথা ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত হত ওই অনুষ্ঠানে। খলতপুর হাই মাদ্রাসা ও আল-আমীন মিশনকে নিয়েও অনুষ্ঠান হয়েছিল। ১৯৯১-'৯২ সালে হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠান ঘিরে বিরাট উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল মিশনে। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর ছুটি পাওয়াও ছিল উন্মাদনার কারণ।' মোরশেদ-মোমিনুর কথা বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদের কিশোরবেলার দিনগুলোয়। আজকের দিন আনন্দে কাটালে তবেই আগামীকাল সেটা হয়ে উঠবে সুখস্মৃতি। শিশু-কিশোরবেলায় হাজার সুখস্মৃতির আভা ছড়িয়ে পড়ছিল মোরশেদ-মোমিনুরের চোখ-মুখ থেকে। যৌথ যাপননামায় জমা হওয়া সকল কথা তুলে ধরার সুযোগ এখানে কম, তাই এবার ফিরে আসি মোরশেদের একক জীবনে।

মোরশেদ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৯৯৩ সালে। পেয়েছিলেন ৬৫ শতাংশ নম্বর। ওই ব্যাচের সকলেই প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে যেকোনো সাধারণ স্কুলের ভালো ছেলে-মেয়েরা মোরশেদের মতো ফল করত। যাই হোক, মোরশেদ মাধ্যমিক পাস করার পর কলা বিভাগে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মিশনে আর্টস পড়ার সুযোগ ছিল না বলে বাড়ি ফিরে ভর্তি হলেন পুরোনো সেই বামাসুন্দরী স্কুলে। ১৯৯৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের মতো নম্বর পেয়ে পাস করলেন। স্নাতক স্তরে পড়ার লক্ষ্যে ভর্তি হলেন হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে। ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময় হঠাৎ তাঁর আব্বা সোলেমান মোল্লা ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। দুটো ইটভাঁটা, পেট্রল পাম্প, হাট ইত্যাদি নিয়ে ব্যাবসার পরিধি তখন অনেকটাই বড়ো। অন্য দাদারাও ইতোমধ্যে পারিবারিক ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বড়োভাই আসগর আলি মোল্লা একটা ইটভাঁটা দেখতেন। আব্বা মারা যাওয়ার পর সব ব্যাবসা দেখতে শুরু করেন তিনি। কাজের বহর কমাতে একটা ইটভাঁটা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় মোরশেদের ওপর। ভাঁটায় প্রায় ১৫০ জন কর্মচারী কাজ করেন। ব্যাবসায় নজর দিতে গিয়ে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আব্বা ছিলেন মাথার ওপর ছাতার মতো। যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো সমস্যা ছিল না। মারা যাওয়ার পর শুরু হল শরিকি বিবাদ। কিছু দিন পর অবশ্য ঝামেলা মিটল। টাকার অঙ্কে বোনেদের অংশ মিটিয়ে দেওয়ার পর ভাইয়েরা ঠিক করলেন আব্বার প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ পাঁচ ভাই ২০ শতাংশ করে পাবেন। আর প্রত্যেকে নিজের মতো করে পৃথক

ব্যাবসায় নজর দিতে গিয়ে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আব্বা ছিলেন মাথার ওপর ছাতার মতো। যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো সমস্যা ছিল না।

ব্যাবসা করবেন। সেইমতো পৈতৃক ব্যাবসা দেখাশোনা করার পাশাপাশি পাঁচ ভাই-ই নিজেদের ব্যাবসা গড়ে তুলেছেন। ইতোমধ্যে ইটভাঁটার ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেজোভাই মোস্তাক আলি মোল্লার সঙ্গে মিলিতভাবে পেট্রল পাম্প ও কনস্ট্রাকশনের ব্যাবসা দেখতে শুরু করেন মোরশেদ। রিয়েল এস্টেটের ব্যাবসা করতে গিয়ে অনেক বড়ো বড়ো ব্যাবসাদারের সঙ্গে চেনাজানা হল। ২০০৪ সালে মোস্তাক আলি মোল্লা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুগার, নার্ভের সমস্যা-সহ নানা জটিলতা দেখা দিল শরীরে। দাদার অসুস্থতার কারণে ব্যাবসা আর তার সঙ্গে দাদার সংসারের দায়িত্বও কাঁধে এসে পড়ল। ইতোমধ্যে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে মোস্তাক সাহেব আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় একদিন মোরশেদকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমার ছেলে-মেয়েদের দেখিস।' তখন তো মোরশেদই সব করেন, দাদার চিকিৎসা, ভাইপো-ভাইঝির পড়াশোনার ভালোমন্দ, সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। তাই প্রিয় দাদাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তুমি এসব কী বলছ। আমিই তো করছি সব, আর আমাকে সব করতে হবে না, তুমি ভালো হয়ে যাবে।' কিন্তু তিনি ভালো হলেন না। ২০০৬ সালে সকল মায়া কাটিয়ে পাড়ি জমালেন না-ফেরার দুনিয়ায়। এক অন্ধকার নেমে এল মোরশেদের জীবনে। তাঁর জীবন গড়ার কাজে যে-মানুষটি সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছেন, তিনিই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। অন্য দাদারা তো সবাই পৃথক তখন। কীভাবে সামলাবেন, সময়ে-অসময়ে পরামর্শ দিয়ে কে পথ চেনাবেন? ভাবনা ঘিরে ধরল তাঁকে। কিন্তু গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে তো ব্যাবসা চলবে না। একসময় শোক সরিয়ে রেখে ব্যাবসার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি করলেন। কাজে মনোযোগী হওয়ায় ধীরে ধীরে অভাবনীয় উন্নতি হল ব্যাবসায়। প্রথম বড়ো কাজ অঙ্কুরহাটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় স্টিল কমপ্লেক্স করা। প্রায় চল্লিশ বিঘা জমির ওপর স্টিল কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে রাজ্যের বড়ো বড়ো কোম্পানি জায়গা নিয়েছে। জমি ডেভলপ করে কোম্পানিদের হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। এই কাজটা চলাকালীন কলকাতাতে জমি নেওয়ার কথা হয়। মোরশেদের বহু দিনের ইচ্ছা ছিল কলকাতায় কিছু করার। তাঁর আব্বা বা দাদারা যা-কিছু করেছেন সবটাই প্রায় গঙ্গার ওপারে। মধ্য-কলকাতার নিউমার্কেটে একটা বিল্ডিং-সহ জমি পাওয়া গেল। পাঁচ কাঠা জায়গা। যা দাম, তার তিরিশ ভাগের এক ভাগ অর্থ তখন মোরশেদের হাতে। ছ-মাসের মধ্যে সব অর্থ দিতে হবে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ওই জায়গাটা বুক করলেন। অর্থ জোগাড় করবেন কীভাবে? বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছিল। ফলে কিছু ধার পেলেন। বাকি অর্থ অঙ্কুরহাটি স্টিল কমপ্লেক্স থেকে ওঠালেন কষ্ট করে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে। ওখানে ল্যান্ড ডেভলপ করে, শেড তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছিল। সেই অর্থে অঙ্কুরহাটির জমির মালিকদের ও শেড তৈরির লোকদের দেওয়ার পর কিছু কিছু অর্থ নিয়ে নিউমার্কেটের জমির মালিককে দেওয়া হচ্ছিল। ছ-মাসের মধ্যে পুরো অর্থ দেওয়ার কথা থাকলেও দৈনিক পত্রিকায় জমি কেনার আগে বিধিবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানতে পারেন একজনের সঙ্গে আর্থিক বিবাদ আছে। সেটা মেটাতে জমির মালিককে বেশ কিছু দিন পার করতে হয়, ফলে বাকি অর্থ জোগাড়ের সময়ও পেয়ে যান মোরশেদ।

এইভাবে প্রথমে পাঁচ কাঠা ও ওই জমির পাশেই আরও দু-কাঠা মোট সাত কাঠা, জমি নিয়েছেন। ওখানে গড়ে তুলেছেন হোটেল, যা শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। ২০১২ সালে চোদ্দো বিঘা জমি-সহ স্লাইডিং জানালার ফ্রেম তৈরির কারখানা অ্যাপেক্স অ্যালুমিনিয়াম ক্রয় করেন। এটিও কেনেন ব্যাবসায়িক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে। পূর্বতন মালিকের মালিকানা স্বত্বের অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্ক লোন নেন। চলতি ব্যাবসায় যে-দেনা ছিল, তা ধরে নিয়েই কারখানার দাম স্থির হয়েছিল। এই উদ্যোগও বর্তমানে অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম চ্যানেলের ক্ষেত্রে অ্যাপেক্স ব্র্যান্ড একটি সুপরিচিত নাম। বর্তমানে ওই কারখানায় প্রায় একশো জন লোক কাজ করেন। এর পরের প্রোজেক্ট ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল হাট। অঙ্কুরহাটিতে ছ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় দুশো বিঘা জমি আছে এই হাটকে কেন্দ্র করে। প্রায় কুড়ি-বাইশ বিঘা রেডিমেড পোশাকের বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে এটিএম, ব্যাঙ্ক, রেস্টুরেন্ট, গেস্ট হাউস, ট্রান্সপোর্টিঙের সুবিধা আছে। প্রায় দশ হাজার দোকান আছে ওই হাটে। চারজন অংশীদার মিলে গড়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়াও হাউজিঙের কাজও করছেন মোরশেদ। বর্তমানে হাউজিঙের কাজ চলছে আন্দুলে। আর-একটা ভিন্ন ধরনের ব্যাবসা গড়ে তুলেছেন মোরশেদ। হাওড়া স্টেশনে যেসব মাছ অন্ধ্রপ্রদেশ বা অন্য রাজ্য থেকে আসে, তা বাক্সবন্দি হয়ে তুষ ও বরফ ঢাকা দিয়ে আসে। এই তুষ অর্থাৎ ধানের খোসা রাইস ব্যান অয়েল তৈরির কাঁচামাল। আগে ওই তুষ যেখানে মাছ নামানো হত সেখানে ফেলে দেওয়া হত। ট্রাক খালি করারও পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। অঙ্কুরহাটির পেট্রল পাম্পে ওই ট্রাকগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে মোরশেদ দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। প্রথমত, ওই তুষ সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওই ট্রাকগুলোয় তেল ভরার ব্যবস্থা করে পাম্পের বিক্রিও বাড়াতে পেরেছেন। এর জন্য ড্রাইভারদের সুষ্ঠুভাবে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ড্রাইভাররাও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হয়ে মাল খালি করা, তেল ভরা ও থাকার সুবিধা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। এই সংগৃহীত তুষ ধুয়ে পরিষ্কার করে রাইস অয়েল উৎপাদক কোম্পানিকে সাপ্লাই দেওয়া হয়। এই কাজে প্রায় জনা কুড়ি লোক নিয়োজিত আছেন। এই হল মোরশেদের ব্যবসায়ের বর্তমান পরিধি। মোরশেদের আব্বা সোলেমান মোল্লা ব্যাবসায়িক কাজকর্মের ভিতটা গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মোরশেদ তার বিস্তার ঘটিয়েছেন নিজস্ব বুদ্ধি কৌশল আর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে।

> প্রথম বড়ো কাজ অঙ্কুরহাটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় স্টিল কমপ্লেক্স করা। প্রায় চল্লিশ বিঘা জমির ওপর স্টিল কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে রাজ্যের বড়ো বড়ো কোম্পানি জায়গা নিয়েছে।

এ তো গেল ব্যাবসায়িক কাজকর্মের কথা। নিজেদের পারিবারিক আর্থিক বিকাশের কথা। যদিও যেকোনো ব্যাবসায়িক উদ্যোগ কেবলমাত্র উদ্যোগী ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যম নয়, সেই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষদেরও আর্থিক বিকাশের মাধ্যম। মোরশেদের ব্যবসায়ীক উদ্যোগে কয়েক-শো মানুষের রুটি-রুজির সংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া সরাসরি আর্থিক অনুদান দিয়ে সমাজের পাশে দাঁড়ানোর উজ্জ্বল ভূমিকাও পালন করে চলেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আব্বাই তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। সোলেমান মোল্লা যখন আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন তখনও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন নিজের আর্থিক ক্ষতির কথা মাথায় না রেখেই। তাঁর এই দানশীলতাই এলাকার মানুষের কাছে ওর কিছু হবে না ইমেজ তৈরি করে দিয়েছিল। হৃদয় প্রসারিত করার ফল সোলেমান মোল্লা পেয়েছিলেন। আল-আমীন মিশনকে তিনি কীভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, তা আপনারা জেনেছেন কিছুটা। শুধু আল-আমীন মিশনকেই নয়, আরও বহু গরিব-দুখি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। মোরশেদ তাঁর আব্বার দেখানো পথ ধরেই হেঁটে চলেছেন। কেবল তিনি তাঁর আব্বার ব্যাবসায়িক উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন না, মানুষের পাশে থাকার দরদি মনের উত্তরাধিকারও বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। কথাটা কতটা সঠিক বললাম, তা বুঝতে পারবেন কয়েকটি অনুদানের কথা জানতে পারলেই। অঙ্কুরহাটিতেই মোরশেদদের দান করা জমির ওপর গড়ে উঠেছে সরকারি বিদ্যালয়, ওঁর আব্বার নামে। জমিটার বর্তমান বাজারদর প্রায় এক কোটি টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন আবাসিক মিশন, মাদ্রাসা, মসজিদে প্রতিবছর নিয়ম করে দান-জাকাত দেন। গত কয়েক বছর ধরে আল-আমীন মিশনে প্রতি বছর একটি করে অ্যাম্বুলেন্স দান করেছেন। এ পর্যন্ত ৫-টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। শুধু আল-আমীন নয়, অন্য মিশনকেও অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। প্রতি বছর আল-আমীন মিশনের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নতুন অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন মোরশেদ। এ-বছর, ২০১৭ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সঞ্চালক দিলদার হোসেন মোরশেদ মোল্লাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন এভাবে, 'এবার ডেকে নিচ্ছি মিশনের এমন এক প্রাক্তন ছাত্রকে, যে ডাক্তার হতে পারেনি, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেনি, হতে পারেনি অধ্যাপক বা সরকারি অফিসারও, কিন্তু সে মানুষ হয়েছে, বড়ো মনের মানুষ।' মোরশেদ যখন মঞ্চে উঠলেন তখন মঞ্চে বসে আছেন আমন্ত্রিত বিশিষ্ট জনেরা। আর মঞ্চের সামনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, ডব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়া প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের সঙ্গে বর্তমানে মিশনে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা আগামীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, অফিসার হবে। সকলের মাঝে থেকেও মোরশেদ আলি মোল্লা তখন অনন্য। কয়েক হাজার দর্শকের দৃষ্টি তখন মোরশেদের মুখের ওপর। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উজ্জ্বল আলোর বলয়। সেই সময় আলোকিত মঞ্চ কি আরও বেশি আলোকিত হয়ে উঠেছিল? সে-দিন ওই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আর আজ যাঁরা এই লেখাটা পড়লেন, তাঁরাই এ-প্রশ্নের উত্তর ভালো দিতে পারবেন। ■

পৃথিবীখ্যাত আর্কিটেক্ট। তারকাস্থপতি (স্টার আর্কিটেক্ট) গোষ্ঠীর একমাত্র নারী স্থপতি, স্থাপত্যের নোবেল হিসেবে পরিচিত প্রিজকার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা। নিজেকে তিনি মহিলা স্থপতি বলা পছন্দ করতেন না।

শিখরছোঁয়া আরব স্থপতি

জাহা হাদিদ

একরামূল হক শেখ

ইরাক নাম শুনলেই ওই দেশের সিকি শতকের শাহেনশা সাদ্দাম হুসেনের ফাঁসির অন্তিম পরিণতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিনটি ছিল ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬। ইরাক ও বিশেষ করে তার রাজধানী বাগদাদের কঙ্কালসম বর্তমান পরিণতিও বিষাদময়। প্রাচীন এই নগরীর গৌরবময় ঐতিহ্য আজকাল আন্দাজ করা মুশকিল। বাগদাদ শব্দের মানে স্রষ্টার উপহার, এখন যেন উপহাস করে বলতে চাইছে স্রষ্টার অভিশাপ। আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আবদাল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ আল-মনসুর (৭১৪—৭৭৫) এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। সময় অষ্টম শতক। টাইগ্রিস নদীর তীরে এই নগরের বায়াত আল-হিকমাহ্ বা হাউস অফ উইজডম অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র। খলিফা হারুন আল-রশিদ (৭৬৩—৮০৯) এটির প্রতিষ্ঠা করলেও, তাঁর পুত্র খলিফা আল-মামুন (৭৮৬—৮৩৩)-এর শাসনকালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চানিকেতনটির চরম উন্নতি ঘটে।

যেকোনো কল্যাণকর মহান সৃষ্টিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে কুলাঙ্গারদের কোনো কালেই অভাব হয় না। সেনাপতি হালাকু খান (১২১৮—১২৬৫)-এর নেতৃত্বে বাগদাদ দখলের মোঙ্গল অভিযান শুরু হয় ১২৫৮-র মধ্য-জানুয়ারিতে। রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি কোনোকিছুই অক্ষত ছিল না এই বর্বরতায়। কয়েক লক্ষ প্রাণহানি হয়। মানবসভ্যতা বিকাশের এই প্রতিষ্ঠান বায়াত আল-হিকমাহ্ ও অন্যান্য লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপি এবং অসংখ্য গ্রন্থ টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপের ফলে, নদীর পানির বর্ণ বইয়ের কালো কালির রঙে রূপান্তরিত হয়। এই গবেষণাগারে দেশ-বিদেশের বহু মনীষী চালাতেন জ্ঞানান্বেষণ। এখানেই বহুবিদ্যাজ্ঞ আবু জাফর মুহাম্মদ মুশা আল-খাওয়ারিজমি (৮৭০—৯৫০) তাঁর গাণিতিক অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর 'কিতাব আল-জবর ওয়াল মুকাবলা' গ্রন্থের আল-জবর থেকেই বীজগণিতের ইংরেজি অ্যালজেব্রা (Algebra) শব্দের উদ্ভব। তাঁর নামের শেষাংশ আল-খাওয়ারিজমি (Al-Khwarizmi) -র ল্যাটিনীকৃত Algoritm থেকেই কম্পিউটার ও সাইবারনেটিক্সে অতি ব্যবহৃত অ্যালগোরিদম (Algorithm) বিষয়টির উদ্ভাবন।

বর্তমান উজবেকিস্তানের খিবা অঞ্চলে জন্ম হলেও আল-খাওয়ারিজমি কীর্তিসমূহ গড়েছেন তাঁর কর্মস্থল বাগদাদে। বিশ শতকের মাঝামাঝি বাগদাদে জন্ম নেন একজন বিশ্ববিশ্রুত ইরাকি। দুনিয়ার অধিকাংশ নগরই তাঁর কর্মস্থল হলেও জন্মস্থল বাগদাদ তথা ইরাকের স্মৃতি তিনি কোনো কালেই ভোলেননি। অন্য আরও একভাবে আল-খাওয়ারিজমির সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। স্কেচ, অঙ্কনশৈলীর নিপুণতা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, গণিত ও জ্যামিতি ছাড়া অ্যালগোরিদমও ব্যবহৃত হয় তাঁর সৃষ্টিকর্মে। ভুবনজয়ী এই সুসন্তানই জাহা হাদিদ (Zaha Hadid)। পুরো নাম জাহা মোহাম্মদ হাদিদ। পৃথিবীখ্যাত আর্কিটেক্ট। তারকাস্থপতি (স্টার আর্কিটেক্ট) গোষ্ঠীর একমাত্র নারী স্থপতি, স্থাপত্যের নোবেল হিসেবে পরিচিত প্রিজকার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা। নিজেকে তিনি মহিলা স্থপতি বলা পছন্দ করতেন না। বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমাকে মহিলা আর্কিটেক্ট বলা আমি অনুমোদন করি না, কারণ, গুরুত্বপূর্ণ হল আমি আর্কিটেক্ট, মহিলা হল পেছনের তথ্য। স্থান ও বস্তু গঠনের প্রচলিত ধারণা, জ্যামিতিক ভাবনা ও নিয়ম-কানুন সবকিছুকেই অতিক্রম করে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন স্থাপত্যকলার এক নতুন ভাষা, এক নতুন অবয়ব। কখনো ধু-ধু মরুভূমির বিশালতা কিংবা শূন্যে উঠে স্থির এক বিরাট বালির ঢেউ, আবার হয়তো আপনার মনে হবে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা আর তরঙ্গোরা ইচ্ছেমতো খেলায় মাতোয়ারা। বস্তুর গঠনগত বৈচিত্র্য ও বিশাল তরঙ্গ, স্থান আর আলোর ব্যবহারের নতুনত্ব— সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি মনে হতে পারে ধাঁধা ও বিভ্রম। তিনি বরাবরই বিমূর্ততার মধ্যে সৌন্দর্য উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাই তিনি মনে করতেন বিমূর্ততা সবকিছুকে মুক্ত করে নতুন পথের সন্ধান দেয়। পুরোপুরি স্বতন্ত্র ধারার স্থাপত্যশিল্পে সকল প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দূর করেছিলেন সব সীমাবদ্ধতা। এ-কারণেই তিনি অনন্য, অতুলনীয়।

মনে পড়ল, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর 'পরিচিতি ও হিংসা' গ্রন্থে বাঙালি স্থপতি নির্মাণবিদ ফজলুর রহমান খান (১৯২৩—১৯৮২)-এর আমেরিকা বিজয়ের কাহিনি শুনিয়েছেন। তাঁর জন্ম স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে, ঢাকার কাছাকাছি

ফরিদপুর জেলার ভাঙারিকান্দি গ্রামে। ঢাকার আর্মানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গের শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকার আহসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তাঁর পড়াশোনা। পরবর্তী কালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গমন। সেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ। নির্মাণ ও ডিজাইনে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি, শিকাগোর একশো-দশতলা সিয়ার্স টাওয়ার, একশোতলা জন হ্যানকক সেন্টার, জেদ্দা বিমানবন্দরের হজ টার্মিনাল, জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। স্থাপত্যশৈলীর উদ্ভাবন ও রূপায়ণের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ফজলুর রহমান খানকে ফাদার অফ টিউবিউলার ডিজাইনস, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরকৌশলী, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের আইনস্টাইন প্রভৃতি অভিধায় সম্মান জানানো হয়। জাহার সঙ্গে ফজলুর রহমান খানের সাক্ষাতের কোনো তথ্য জানা নেই, তবে স্কাইস্ক্র্যাপার বা গগনচুম্বীর উদ্ভাবক হিসেবে অগ্রজ স্থপতির নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন জাহা হাদিদ। স্কাইস্ক্র্যাপার নিয়ে জাহার বক্তব্য হল, একজন মহিলা হিসেবে আমি নিশ্চিত, আমি খুবই সুন্দর গগনচুম্বী অট্টালিকা গড়তে পারি।

পরিবারনামা

ফিলিস্তিনের নাজারেথ শহর খ্রিস্টানদের পবিত্র ভূমি। নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে এখানেই হজরত ইশা (যিশু খ্রিস্ট) শৈশব কাটিয়েছেন। জাহার বাবা আলহাজ মোহাম্মদ হাদিদ ১৯০৭-এর পয়লা জানুয়ারি এই পবিত্র স্থলে জন্মান। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের স্নাতক মোহম্মদ হাদিদ ১৯৩১-এ দেশে ফিরে অর্থমন্ত্রিত্ব সামলেছেন। ব্রিটেনের লেবার পার্টির আদলে গঠিত প্রগতিশীল আহালি গোষ্ঠীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৩৬-এ এক অভ্যুত্থানে আহালিদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান বাকর সিদকি। ক্ষমতার দম্ভে বাকর সিদকির স্বৈরতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ আহালি নেতৃবৃন্দ একযোগে পদত্যাগ করে গঠন করেন প্রগতিশীল উদারপন্থী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। ১৯৫৮-র পরবর্তী অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার আবদ আল-কারিম কাশিমের নেতৃত্বাধীন সরকারে পুনরায় অর্থমন্ত্রী হন তিনি। মাত্র দু-বছরের মেয়াদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশ থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পোদ্যোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মপরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। দেশের আপামর জনসাধারণের যন্ত্রণা লাঘবের আত্মিক প্রেরণা তাঁর মধ্যে বরাবরই সক্রিয় ছিল। ১৯৬৩-তে বাথ পার্টি ইরাকের ক্ষমতা দখল করলে তাঁর বিচার বিভাগীয় তদন্ত, অন্তরিন ও সম্পদ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান এবং পুরোপুরি নিজ ব্যাবসায় মনোনিবেশ করেন। বাথ পার্টি ও ইরাকের সর্বময় কর্তা সাদ্দাম হুসেনের রাজনৈতিক ডামাডোল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর ওপর প্রতিহিংসার মাত্রা বাড়তে থাকলে, ১৯৯৫-এ তিনি সপরিবারে লন্ডন পাড়ি দেন। এখানেই ১৯৯৯-এর তেসরা অগাস্ট তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। নিজ পিতা নিয়ে জাহা গর্ব করে বলতেন, 'আমার বাবা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ। ইরাকি ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে একজন, যিনি প্রগতিতে বিশ্বাস করতেন।' জাহার মা ওয়াহিদা আল-সাবুনজি ছিলেন মশুলের নামকরা চিত্রশিল্পী। জাহার দু-ভাই হায়শাম ও ফুলাশ। পরবর্তী কালে তাঁদের নিকট আত্মীয়স্বজন একে একে ইরাক ছেড়ে জর্ডনে আশ্রয় নেন।

> 'যখন আমি পড়াতাম, আমার সব সেরা শিক্ষার্থীই ছিল ছাত্রী।' তাহলে কি স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে নারীদের গভীর কোনো সম্বন্ধ বিদ্যমান !

জাহা হাদিদ।

পড়াশোনা

জাহার জন্ম বহু-সংস্কৃতিবাদের প্রতি আস্থাশীল সুশিক্ষিত উদার মুসলমান পরিবারে। তাঁর জন্মকাল ৩১ অক্টোবর ১৯৫০। বিদেশে শিক্ষিত জাহার বাবা কর্মজীবনের সূচনা করেন এক্সিকিউটিভ হিসেবে। পরবর্তীকালে নিজ ব্যাবসার পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ছিলেন। দু দু-বার দেশের অর্থমন্ত্রী হন তিনি। এরকম একজন যে উদারবাদী হবেন, তা বলাই বাহুল্য। জাহা ও তাঁর ভাই সরকারি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে মিশনারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছিলেন। জাহার প্রাথমিক শিক্ষা বাগদাদের এক ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলে। সন্ন্যাসিনী দ্বারা পরিচালিত এটি ছিল ফরাসি মাধ্যমের স্কুল। 'নিউজউইক' ম্যাগাজিনের সাংবাদিক ক্যাথলিন ম্যাকগুইগানকে এক সাক্ষাৎকারে জাহা জানিয়েছিলেন, তাঁদের ওই স্কুলের খ্রিস্টান পড়ুয়ারা চ্যাপেলে প্রার্থনা করার সময় মুসলমান ও ইহুদি পড়ুয়ারা স্কুলমাঠে খেলাধুলা করত। জাহা তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্রিটেন ও সুইৎজারল্যান্ডে সম্পন্ন করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে আসেন। ১৯৬৮-তে ভর্তি হন লেবাননের বেইরুট শহরের আমেরিকান ইউনিভারসিটিতে। ১৯৭১-এ গণিতে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময় আর্কিটেকচার পড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডনের অভিজাত আর্কিটেকচারাল অ্যাসোসিয়েশন স্কুল অফ আর্কিটেকচারে ভর্তি হন। ১৯৭৭-এ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেন এ-পাঠ। বহু প্রথিতনামা স্থাপত্যবিদ ও শিক্ষকের সান্নিধ্য তিনি এখানে পেয়েছেন। তাত্ত্বিক ও নগর-পরিকল্পনাকারী অধ্যাপক রেম কুলহাস (জন্ম ১৯৪৪) স্নাতক সমাবর্তনে তাঁর ছাত্রী জাহার প্রশংসা করে বলেন, 'a planet in her own orbit' অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে সে একটি গ্রহ। এথেন্সে জন্মানো অধ্যাপক এলিয়া জেঙ্কেলিস ও ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। তাঁর মতে, জাহা এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। তাঁর আরও সকৌতুক মন্তব্য, 'আমরা তাকে ৮৯ ডিগ্রির উদ্ভাবক বলি। তার কোনোকিছুই ৯০ ডিগ্রি ছিল না।' শিক্ষার্থী হিসেবে জাহা হাদিদ যে অনন্য ছিলেন, তাঁর শিক্ষকদের সপ্রশংস উক্তিই তার প্রমাণ। শিক্ষক হয়ে জাহা যখন বলেন, 'সুশিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেখতে হবে মানবসমাজে কীভাবে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এটি শুধু চাকরি পাওয়ার এক যোগ্যতা নয়, শিক্ষিত হওয়া সংক্রান্ত বিষয় এটি।' এতে শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধই প্রকাশিত।

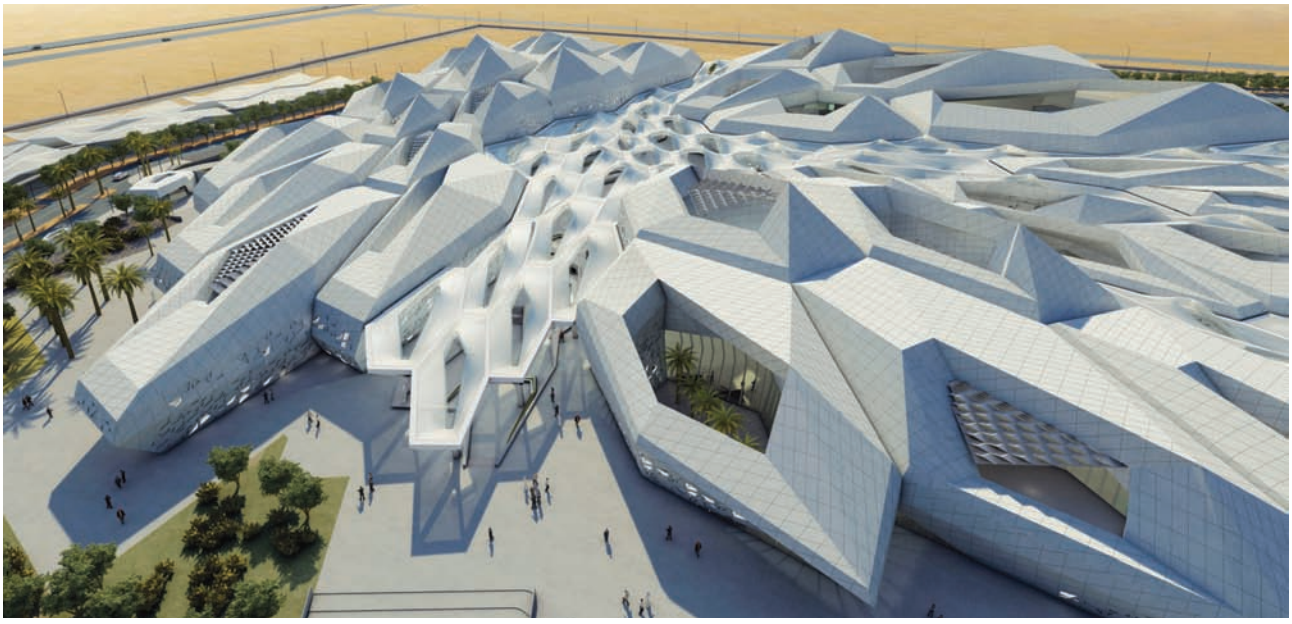

জাহা হাদিদের স্থাপত্যকর্ম। না কি শিল্প?

শিক্ষকতা

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্ক ভন ডোরেন (১৮৯৪—১৯৭২)-এর বহুল প্রচলিত তত্ত্ব হল— দ্য আর্ট অফ টিচিং ইজ দ্য আর্ট অফ অ্যাসিস্টিং ডিসকভার। জাহারও শিক্ষকতা জীবনের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষাদানের দক্ষতাই উদ্ভাবনে সহযোগিতার কৌশল। আর্কিটেকচারাল অ্যাসোসিয়েশনে পাঠ চুকিয়ে স্থাপত্যবিদ্যার নবরূপ দানে তিনি উৎসাহী ছিলেন। ভিন্ন-ভিন্নরকম ও রঙের আঁকিবুকি এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মডেলকে ভেঙেচুরে তিনি নয়া সৃষ্টির কসরতে মশগুল থাকতেন দিনরাত। এরই মাঝে তাঁর নিজ শিক্ষানিকেতন আর্কিটেকচারাল অ্যাসোসিয়েশনে পুনরায় প্রবেশের সুযোগ উপস্থিত হয়। অবশ্য এ-বারে শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীকালে স্থাপত্যশিল্পে বিশ্ব জয় করলেও তাঁর জীবিকার শুরু কিন্তু শিক্ষকতা দিয়ে।

কেম্ব্রিজ, শিকাগো, কলম্বিয়া, ইলিনয়, হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ ডিজাইন, জার্মানির হামবুর্গস্থিত হ্যাকশুয়েল ফুয়ের বিলডেনড কাঁস্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চলল তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রদান। এই সময় দুনিয়ার সমস্ত অভিজাত স্থাপত্য জার্নালে তাঁর মৌলিক ডিজাইন ও প্রকল্প প্রকাশিত হতে থাকে। পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষকতার সুখ্যাতিও। ১৯৯০-এ তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিকাগোর স্কুল অফ আর্কিটেকচারে শুলিভান চেয়ার প্রফেসরশিপে আসীন হন। ওহিয়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নোলটন স্কুল অফ আর্কিটেকচার, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স স্টুডিয়ো, ইয়েল স্কুল অফ আর্কিটেকচারে আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের ইরো সারিনেন ভিজিটিং প্রফেসর হন তিনি। ভিয়েনার অ্যাপ্লায়েড আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউটে জাহা হাদিদ মাস্টার ক্লাস ভার্টিক্যাল স্টুডিয়োতে ২০০০ থেকে অতিথি অধ্যাপনা করেছেন। ভিয়েনার শিক্ষকতা জীবন নিয়ে তাঁর বাস্তববাদী কথা হল, 'আমি বিশ্বাস করি না আপনি স্থাপত্য শেখাতে পারেন, কেবলই অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম।' ভিয়েনার এই শেখানোর নাম মাস্টার ক্লাস। কারণ, আপনি একজন গুরু এবং পড়ুয়ারা আপনার সঙ্গে পাঁচ বা ছয় বছর থাকছে। শেষে তারা আপনার বিশেষজ্ঞতা ও আপনার ঝুলির সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবে। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষানবিশ স্থপতিদের খুবই প্রিয় ছিলেন। একজন অগ্রজ হিসেবে নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুজদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন তিনি। নতুনদের মাঝে সৃষ্টির প্রেরণা ও তাদের অধিকতর কর্মক্ষম করতে তিনি নিজেকে উজাড় করতেন। জাহার শিক্ষকদের অধিকাংশেরই মতে ছাত্রাবস্থায় জাহা সেরা ছাত্রী ছিলেন। শিক্ষক জাহা তাঁর পড়ুয়াদের বিষয়ে যে-কাহিনি শুনিয়েছেন, আসুন সেটি শুনে নিই। তিনিও জোর গলায় বলেছেন, 'যখন আমি পড়াতাম, আমার সব সেরা শিক্ষার্থীই ছিল ছাত্রী।' তাহলে কি স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে নারীদের গভীর কোনো সম্বন্ধ বিদ্যমান !

স্থাপত্যের বিনির্মাণ

আর্কিটেক্ট শব্দের পরিচিতি স্থপতির চেয়ে বেশি, যদিও প্রথমটি কেবলই পরেরটির ইংরেজি রূপ। স্থাপত্য বা আর্কিটেকচার হল দালান ও অন্যান্য বাস্তব কাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণপ্রক্রিয়া ও তার বাস্তবায়ন। ইংরেজি architecture শব্দের উৎস লাতিন architectura, যার অর্থ the art of building, অর্থাৎ বিল্ডিংশিল্প। স্থাপত্যের সঙ্গে স্থাপনার সরাসরি সম্পর্ক। যেকোনো স্থাপনার দুটো দিক, নকশা ও নকশার বাস্তবায়ন। নকশাকারী ব্যক্তিই আর্কিটেক্ট। নকশা অনুযায়ী কাঠামোগত বাস্তবায়নের রূপকারই ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলী। মিশরের পিরামিড, ইংল্যান্ডের সলসবেরি ক্যাথিড্রাল, বাংলাদেশের ষাট-গম্বুজ মসজিদ, আগ্রার তাজমহল, তামিলনাড়ুর বৃহদেশ্বর মন্দির, আমাদের রাজ্যের মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন।

'আমি যখন ছ-বছরের, আমার ফুফু মশুলে এক বসতবাড়ি তৈরি করার মনস্থ করেন। ড্রয়িং ও বাড়ির মডেল নিয়ে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন আমার বাবার এক বন্ধু। অন্যদের সঙ্গে আমিও সেগুলো দেখতাম। ইতোমধ্যে আমি ইতিহাস বইয়ে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান ও অনেক কিছু পড়ে ফেলি। হয়তো এ-ঘটনাই আমাকে আর্কিটেক্ট হতে উদ্দীপ্ত করেছিল।'— এ-কথা জাহা হাদিদের। ছোটো থেকেই স্থাপত্যের প্রতি টান ছিল তাঁর। তাঁর বসবাসের পরিবেশে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু দেখলে জানলে বা শুনলে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠতেন। তাঁর ঘরে এক বিপরীত প্রতিসাম্য আয়না ছিল, যার ওপরে যেকোনো প্রতিচ্ছবি বিমূর্ত ও ভাঙাচোরা হয়ে দেখা যেত, এটা তাঁকে ভাবিয়েছে। তাঁর ঘরের কৌণিক আঙ্গিকের আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, সোফা এবং পারস্যদেশীয় রঙিন নকশাপূর্ণ জ্যামিতিনির্ভর শৈল্পিক কার্পেট থেকেও তিনি স্থাপত্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহা বেইরুটে

গণিতের পাঠ চুকিয়ে লন্ডনের আর্কিটেকচারাল অ্যাসোসিয়েশনে বহু বিশ্ববরেণ্য স্থাপত্যবিশারদকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। অন্যতম শিক্ষাগুরু এলিয়া জেঙ্কেলিস জাহার প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, 'তার সিঁড়ির নকশা দেখে মনে হবে আপনার মাথা ছাদে ঠেকে যাবে। জায়গা ক্রমেই কমতেই আছে। ছাদের উপরের কোণে গিয়ে আপনার যাত্রা শেষ। সে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, তার মাথায় সবসময় বৃহৎ ভাবনা। কোনোকিছু জোড়া লাগাবার কাজ থাকলে, সে জানত, সেটি পরে করতে পারবে। তার এ-সিদ্ধান্ত সঠিক। চতুর্থ বর্ষে তার প্রোজেক্ট ছিল সেতুর আদলে একটি হোটেলের নকশা করা। এটি রাশিয়ার সুপ্রিম্যাটিস্ট বা সর্বোৎকৃষ্টবাদ শিল্পী কাজিমির ম্যালেভিচের অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি।'

১৯৭৭-এ স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর ভূতপূর্ব অধ্যাপক কুলহাস ও জেঙ্কেলিস নেদারল্যান্ডের রটারডাম

কাতারে ২০২২-এ ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য এক নির্মীয়মাণ আল-ওয়াকারাহ্ স্টেডিয়ামের আর্কিটেক্টও জাহা। এই স্টেডিয়ামের নকশার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কাতারের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ এক ধরনের নৌকার ডিজাইন থেকে, যার কাতারি নাম ঢেউ নৌকা।

শহরস্থিত তাঁদের ফার্ম সংস্থা মেট্রোপলিটন আর্কিটেকচারে কাজ করতে বলেন। তখন হাদিদ বলেন, তিনি একজন পার্টনার বা অংশীদার হিসেবে যোগ দিতে আগ্রহী। জবাবে তাঁরা হ্যাঁ বলেন, কিন্তু অধীনস্থ হিসেবে। হাদিদ তখন সটান না বলেন। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মসম্মানী জাহা তবুও তাঁর শিক্ষকদের সম্মানার্থে কিছুদিন সেখানে কাজ করেছিলেন। এখানেই প্রখ্যাত স্থাপত্য-প্রকৌশলী পিটার রাইসের সহায়তা ও উৎসাহ তিনি পেয়েছেন। সমকালে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেয়ে ১৯৮০-তে তিনি লন্ডনে তাঁর নিজস্ব ফার্ম জাহা হাদিদ আর্কিটেক্টস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর পেশাদারি যাত্রা কিন্তু মসৃণ ছিল না। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'একজন নারী এবং একজন প্রবাসী হয়ে স্থাপত্য করা চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে যখন আপনি অন্যরকম কিছু করেন। আমি এটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি, কারণ, মানুষজন জানত না আমার সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমাকে উন্মাদ মনে হত, খুবই মাথা গরম এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাগ উঠে যায় সময়ে সময়ে, কিন্তু আমিও কাজ নিয়ে খুব নাছোড়বান্দা, অবিচল এবং আসক্ত ছিলাম।'

শুরুতেই হংকং ও ওয়েলসে তাঁর প্রকল্পদুটো রূপায়িত না হওয়ায় তিনি মুষড়ে না পড়লেও একটু থমকে যান। বিশেষ করে ওয়েলসের অপেরা হাউজের প্রকল্প, কারণ, বিচারকদের বিচারে এটির নকশা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করে। কিন্তু ওয়েলস সরকার এটির খরচে অনীহা দেখায়। জাহার প্রথম স্থাপত্যস্বপ্ন এভাবেই ভেঙে গেলেও বাস্তুকলাবিদ জাহার সৃষ্টিকুশলতাকে কোনোকিছুই দমাতে পারেনি। ১৯৮৮-তে নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে জাহা-সহ ছ-জনের চিত্র ও নকশার প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল— স্থাপত্যে বিনির্মাণবাদ। এটির বিচারক ছিলেন আমেরিকান স্থপতি ফিলিপ জনসন এবং নিউজিল্যান্ডীয় মার্ক উইগলে। প্রদর্শনীতে জাহার সৃষ্টি খুবই প্রশংশিত ও দেশ-বিদেশের জার্নালে প্রকাশিত হলে জাহার পরিচিতি ও খ্যাতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাথমিক পর্বের বিড়ম্বনা ও আপাত ব্যর্থতাকে কাটিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে একের পর এক প্রকল্পের সফলতা জাহাকে অচিরেই সুখ্যাত করে তোলে।

জার্মানির প্রখ্যাত আসবাবপত্র কোম্পানির নাম ভিটরা। সংস্থার প্রেসিডেন্ট ও ডাইরেক্টর রলফ ফেলরাম জাহাকে তাঁদের কারখানার জন্য ছোটো এক ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ফরমাশ দেন। জাহার তৈরি নকশা ও মডেলের স্টাইল ছিল একেবারে বৈপ্লবিক, চালু রীতির বাইরে। কাঁচা কংক্রিট ও কাচ মিলিয়ে যৌথ উপাদানের এটি এক অভিনব স্থাপত্যীয় ভাস্কর্য। এটির ধারালো তির্যক ছাঁচগুলো ছিল একসঙ্গে মাঝখানে অনবরত ধাক্কারত। অনেকটা বিধ্বস্ত বিমানের মতো দেখতে প্রকল্পটি ছিল এক জ্যামিতিক ভাবনার ফসল। এটি দেখলেই মনে হবে, সে অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের যেন চিৎকার করে বলছে, 'জরুরি!' কেননা, এখান থেকেই তারা দ্রুতবেগে দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। প্রকল্পটি রূপায়ণের আগেই পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এটির নকশা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। ১৯৯৪-এ স্থাপন তো হল, কিন্তু ততদিনে সে-দেশের অগ্নিনির্বাপক আইনের পরিবর্তনের ফলে এটিকে ফায়ার স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা গেল না। অগত্যা ভিটরা কর্তৃপক্ষ দুনিয়ার নামকরা স্থপতিদের ডিজাইন ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনীস্থল হিসেবে এটিকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। ভেইল আম রেইনের ভিটরা ফায়ার স্টেশন ওরফে প্রদর্শনীশালাই হল পেশাদার আর্কিটেক্ট হিসেবে জাহার লঞ্চিং প্যাড। পরবর্তী পেশাগত প্রকল্পের জন্য তাঁকে তাঁর ভূতপূর্ব শিক্ষক কুলহাস-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিয়ো সিনসিনাটির কনটেম্পোরারি আর্টস সেন্টার প্রকল্পটিতে অধ্যাপক রেম কুলহাস নন, শেষতক বাজিমাত করেন তাঁরই শিষ্যা জাহা হাদিদ। আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ১৯৯৪-র ভিটরা ফায়ার স্টেশন থেকে ২০১৬-র বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প হারবার হাউস-তক, দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে বহু প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন। বিশেষ কয়েকটি হল— লন্ডনের সার্পেন্টাইন স্যাকলার গ্যালারি, গ্লাসগোর মিউজিয়াম অফ ট্রান্সপোর্টের রিভারসাইড মিউজিয়াম, চীনের গুয়াংঝু অপেরা হাউজ, রোমের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি আর্ট, বিএমডব্লিউ সেন্ট্রাল বিল্ডিং ইত্যাদি। স্ট্র্যাটফোর্ডের লন্ডন অ্যাকুয়াটিক সেন্টার দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। দুটি ৫০ মিটার লম্বা পুল ও একটি ডাইভিং পুল নিয়ে তৈরি সেন্টারটির নকশার বৈশিষ্ট্য হল, তরঙ্গের বিমূর্তায়ন। জাহাজ-আকৃতির হংকং পলিটেকনিক ইউনিভারসিটির ভবন কিংবা ইতালির ক্রোনপ্লাৎস পর্বতের চূড়ায় পাহাড় কেটে জাদুঘর দেখে বোঝা মুশকিল এগুলো স্থাপত্য না ভাস্কর্য। জাহা নতুনত্ব ও বিপ্লবী চেতনার অত্যাধুনিক স্থাপত্যকর্মে বিশ্বাসী হলেও প্রকল্প-দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং

প্রাচীন স্থাপনার কথা মাথায় রেখে রীতিমতো গবেষণা করেই ডিজাইন গড়তেন। জার্মানির উলফসবার্গ ফিয়ানো সায়েন্স সেন্টার তৈরিতে ইউরোপের প্রাচীন ক্যাথিড্রাল থেকে প্রেরণা নিয়েছেন। এটি দেখে মনে হবে একটি চার্চ। জাহা চার্চই বানিয়েছেন, তবে প্রার্থনার নয়, বিজ্ঞানের।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রকল্প

অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তব এটাই যে, তাঁর জন্মভূমি ইরাক-সহ মধ্যপ্রাচ্যে জাহার কীর্তি খুবই সীমিত। জাহার কিন্তু প্রবল ইচ্ছা ছিল মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন, 'নিশ্চিতভাবে মধ্যপ্রাচ্যে কাজের চিহ্ন রেখে যাওয়া একজন আরব হিসেবে আমাকে খুশি করবে। শহরের প্রতিটি অংশ-সহ শহরের সমস্ত স্পেস নিয়ে একটা প্রোজেক্ট করতে পারলে আমি খুশি হব।' লেবাননের বেইরুটস্থিত তাঁরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্সাম ফারেস ইনসটিটিউট ফর পাবলিক পলিশি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ভবনটির নির্মাণ ২০০৬ সালে শুরু হয়। এটিই মধ্যপ্রাচ্যে জাহার প্রথম প্রোজেক্ট। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে শেখ জায়েদ সেতু এবং সৌদি আরবের রিয়াধে কিং আবদুল্লাহ্ পেট্রোলিয়াম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ছাড়া পূর্ণভাবে রূপায়িত মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো প্রকল্পের হদিশ নেই।

একটু খোঁজ করে জানা গেল তাঁর জন্মভূমির জন্যও জাহার হাতে কাজ ছিল। দুর্ভাগ্য এটাই যে, কাজগুলো সমাপ্ত করার আগেই তাঁকে চলে যেতে হয়। ২০১০-এ ইরাক সরকার জাহাকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইরাকের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য আহ্বান জানায়। ২০১২-র দোসরা ফেব্রুয়ারি লন্ডনে এই বিষয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়। এ ছাড়াও দক্ষিণ বাগদাদে ইরাকের সংসদ ভবন নির্মাণের বরাতও তিনি পেয়েছিলেন, যদিও বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাহার নিজস্ব সংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া সংসদ ভবনের নকশা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাশের দেশ কাতারে ২০২২-এ ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য এক নির্মীয়মাণ আল-ওয়াকারাহ্ স্টেডিয়ামের আর্কিটেক্টও জাহা। এই স্টেডিয়ামের নকশার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কাতারের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ এক ধরনের নৌকার ডিজাইন থেকে, যার কাতারি নাম ঢেউ নৌকা। মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত অন্যান্য মুসলমান দেশেও জাহার সৃষ্টি প্রায় শূন্য। ব্যতিক্রম আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে দেশের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হায়দার আলিয়েভ (১৯২৩—২০০৩)-এর স্মৃতিতে হায়দার আলিয়েভ সংস্কৃতি-কেন্দ্র। একটি মিলনায়তন, গ্যালারি হল ও একটি জাদুঘর-বিশিষ্ট স্থাপনাটিতে অনেকেই বরফাচ্ছাদিত অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা সদৃশ মিছিল বলেই আখ্যায়িত করেছেন। প্রায় ৭৪ মিটার উঁচু সেন্টারটি ২০০৭ সালে শুরু হয়ে ২০১০-এ শেষ হয়। সেন্টারের স্টাইল দেখে মনে হবে, স্রোত ধরণী থেকে উঁচুতে উঠে আবার যেন আছড়ে পড়ছে ধরার বুকে অর্থাৎ স্রোতের চক্রধারা। এর কোনো সীমানা নেই, উন্মুক্ততায় মুগ্ধ হতে হয় স্থাপনাটি দেখে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি যেন খোলা মনে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের জনগণকে আহ্বান করছে।

ইন্টিরিয়ার ডিজাইন ও অন্যান্য

শিক্ষকতা ও দিনরাত নির্মাণের কাজকর্মে ব্যস্ত থেকেও জাহা সময় বের করে বিচিত্র সব সৃষ্টিতে মগ্ন থাকতেন। লন্ডনের মিলেনিয়াম ডোমে মাইন্ড জোনের মতো উঁচু মানের ইন্টিরিয়ার ডিজাইন তাঁরই। একদিকে ফ্লুয়িড

শিক্ষকতা ও দিনরাত নির্মাণের কাজকর্মে ব্যস্ত থেকেও জাহা সময় বের করে বিচিত্র সব সৃষ্টিতে মগ্ন থাকতেন। লন্ডনের মিলেনিয়াম ডোমে মাইন্ড জোনের মতো উঁচু মানের ইন্টিরিয়ার ডিজাইন তাঁরই।

ফার্নিচার বানাচ্ছেন, আবার হাইড্রোজেনচালিত তিন চাকার অটোমোবাইল যান জেড কারের কাঠামোর নকশা উদ্ভাবন করছেন। ২০০৯-এ তিনি জনপ্রিয় পোশাক-প্রস্তুতকারী সংস্থা ল্যাকোস্তের হাই ফ্যাশান বুট ও ইতালির আসবাব প্রস্তুতকারী বি অ্যান্ড বি ইটালিয়ার জন্য মুন সিস্টেম সোফার ডিজাইন করেছেন। ব্রিটিশ সিন্থপপ দল পেট শপ বয়েজের অ্যালবাম নাইট লাইফের মঞ্চের ডিজাইনারও তিনি। তাঁর বৈচিত্র্যময় নকশার তালিকায় বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র, নৌকা, গৃহসজ্জার সামগ্রী, পেইন্টিংস এবং নানারকম গহনা ও জুতো। ১৯৭৮-এ নিউইয়র্কের মিউজিয়াম থেকে ২০১৫-র রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবাগের মিউজিয়াম-তক তাঁর ডিজাইনের প্রদর্শনী কখনো থেমে থাকেনি। ২০০৪ সালের এক ডকুমেন্টরি ফিল্মে তাঁর চলমান কাজ নিয়ে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেসবের নকশাও ক্যামেরায় ফুটে ওঠে। বিবিসির সকালের রেডিয়ো অনুষ্ঠান টু ডের ২০০৯ সালের দোসরা জানুয়ারি পর্বের অতিথি সম্পাদক ছিলেন জাহা। লন্ডনের ক্লার্কওয়েলে তাঁর সংস্থায় পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান নবীন ও প্রবীণ স্থপতি-সহ চারশোর বেশি কর্মচারী কর্মরত। ৪৪-টি দেশে প্রায় ৯৫০-টির মতো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জাহা হাদিদ আর্কিটেক্টস।

স্থাপত্যের নোবেল— প্রিজকার পুরস্কার

ভুবনময় হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদির ব্যাবসায় হায়াত এক পরিচিত নাম। আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থাটি ৫৪-টি দেশে প্রায় ৭০০-টি হোটেলের মালিক। এটির প্রতিষ্ঠাতা হায়াত রবার্ট ভন ডেন এবং জ্যাক ডায়ার ক্রৌচ। ভারতে প্রায় প্রত্যেক বড়ো শহরে এঁদের হোটেল আছে। পশ্চিমবাংলার সল্টলেকে এঁদের ফাইভ স্টার হোটেলের নাম হায়াত রেজেন্সি। পরবর্তী কালে হায়াতের মালিকানা ক্রয় করেন চিকাগোর জ্যা এ প্রিজকার (১৯২২—১৯৯৯) ও তাঁর ভাই। প্রিজকার পরিবারের হায়াত ফাউন্ডেশন ১৯৭৯ সালে স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নে এক আন্তর্জাতিক পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর এক বা একাধিক স্থপতির গোষ্ঠীকে দ্য প্রিজকার আর্কিটেকচার প্রাইজ দেওয়া হয়। পুরস্কারবাবদ দেওয়া হয় একটি তাম্র পদক ও এক লাখ আমেরিকান ডলার। এটির প্রথম প্রাপক আমেরিকান স্থপতি ফিলিপ জনসন (১৯০৬—২০০৫)। প্রথম মহিলা ও প্রথম আরব হিসেবে ২০০৪ সালে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মান লাভ করেন জাহা হাদিদ। প্রিজকার পুরস্কারের ২৬ বছরের ইতিহাসে এটি এক মাইলস্টোন। সেন্ট পিটার্সবার্গের দ্য স্টেট হেরিটেজ মিউজিয়ামে ২০০৪-র ৩১ মে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে জাহাকে পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হায়াত ফাউন্ডেশনের সভাপতি টমাস জে প্রিজকার ঘোষণা করেন, 'আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন জুরি প্রথম বার একজন মহিলাকে সম্মান জানিয়েছেন। পুরস্কারের স্পনসর হিসেবে এটি আমাদের শ্লাঘার বিষয়।' পুরস্কার গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া-ভাষণে জাহা প্রিজকার পরিবার-সহ তাঁর পরিবার, শিক্ষকবর্গ, পড়ুয়া, বন্ধুবান্ধব, সহযোগী, গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু এবং এই বলে শেষ করেন, 'উদ্দীপক বিষয় হল এই যে, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি ক্যানভাস থেকে বিভিন্ন নির্মাণস্থলে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং আমি আশাবাদী প্রিজকার

বক্রতার সৌন্দর্য।

পুরস্কারের এই মাইলফলক এই কাজে আমাকে আরও জোরে তাড়িত করবে।' ১৯৮২-র গোল্ড মেডেল আর্কিটেকচারাল ডিজাইন থেকে রয়্যাল ইনসটিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট (রিবা)-২০১৬ গোল্ড মেডেল-তক স্থপতি হিসেবে বিশ্বের প্রায় সব পুরস্কারই তিনি পেয়েছেন। পুরস্কার ও সম্মানের সংখ্যা প্রায় একশোর বেশি।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস, আমেরিকান ইনসটিটিউট অফ আর্কিটেক্টস, লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ আর্টস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাম্মানিক সদস্য বা ফেলো ছিলেন। সাম্মানিক ডিগ্রি বা পিএইচডি লাভ করেছেন বেইরুটের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভারসিটি অফ লন্ডন, ইয়েল, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্কের প্রাচ ইনসটিটিউট প্রভৃতি থেকে। তিনি ছিলেন ইউনেস্কোর আর্টিস্ট অফ পিস। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও ছিলেন তিনি। 'ফোর্বস' পত্রিকার বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ১০০ জন মহিলার তালিকায়, 'টাইম' ম্যাগাজিনের বিচারে এক প্রভাবশালী চিন্তক, 'নিউ স্টেটসম্যান' দৈনিকের জগতের সেরা ৫০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায়, 'গার্ডিয়ান' দৈনিকের পঞ্চাশোর্ধ্ব ৫০ জন সুবেশীর তালিকায়, বিবিসি রেডিয়োর যুক্তরাজ্যের ১০০ জন সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন জাহা। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে ২০১৬-তে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরের এক স্কোয়ারের নাম জাহা হাদিদ প্লিন রাখা হয়।

মুসলমান বিশ্বের মাত্র তিনজন নারী নোবেল লাভ করেছেন। তিন জনই শান্তির জন্য এবং মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীই তাঁদের প্রধান পরিচয়। ২০০৩ সালে ইরানের শিরিন এবাদি (জন্ম ১৯৪৭) দিয়ে শুরু, পরবর্তী কালে ২০১১-এ ইয়েমেনের তায়াক্কোল কারমান (জন্ম ১৯৭৯) এবং ২০১৪-এ পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই (জন্ম ১৯৯৭) নোবেল লাভ করেন। এঁদের কৃতিত্বকে ছোটো না করেও বলা যায় পাশ্চাত্যজগতে পেশাদারিত্বে নিজ যোগ্যতায় শীর্ষস্থান দখলের সংগ্রাম ও সাফল্যে জাহা হাদিদ নিশ্চিতরূপেই তুলনাহীন। লেখিকা বিপাশা চক্রবর্তী তাই লিখেছেন, 'একইসাথে একজন মুসলিম ও নারী হিসেবে নয়, বরং তিনি তাঁর কর্মগুণেই ছিলেন ব্যতিক্রম। এক এবং অদ্বিতীয়া। অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই পুরুষশাসিত স্থাপত্যশিল্পের জগতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমকালে তাঁর কাছাকাছি যাবার যোগ্য স্থপতি খুব কমই আছেন।' স্থাপত্যবিজ্ঞানের প্রতি হাদিদের নিষ্ঠাকে সমাদর করে ব্রিটিশ সরকার ২০০২-এ কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (সিবিই) এবং ২০১২-এ ডেইম কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (ডিবিই) সম্মান প্রদান করেন। ডেইম হল নাইটের সমগোত্রীয়, যা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। সে-কারণে জাহাকে ডেইম জাহা হাদিদও বলা হয়।

এক ভারতীয় স্থপতির স্মরণ

এটা ঠিক, আমাদের বিশাল ভারতে জাহার কোনো প্রকল্প নেই, সম্ভবত তিনি আমাদের দেশে কোনোদিন আসেননি। কিন্তু তাঁর স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে ভারতের, বিশেষ করে তরুণী স্থপতিদের প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। জাহার প্রতি এক ভারতীয় তরুণী শ্রদ্ধা জানালেন এভাবেই: 'তাঁর প্রয়াণের খবর শুনে আমি ভাবলাম এক বিশাল বৃক্ষের পতন হল। আমরা হারালাম স্থাপত্যের জন্য অনুসরণীয় এক ম্যাসকটকে। গোটা দুনিয়ায় আমাদের প্রজন্মের আর্কিটেক্ট, যাঁরা সামাজিকভাবে সচেতন ও পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয়েও হতে পারেন নিজ অবস্থানে অনেক সময়ই অকার্যকর। আজকের বিশ্বে একজন হাদিদের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। একজন কর্মরত স্থপতি ও ডিজাইনার হিসেবে শ্রদ্ধা করি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহসিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়কে। ভারতের অবিকশিত ডিজাইন দুনিয়ায় ঠিকাদার, প্রকল্প পরিচালক ও ডিজাইন কিউরেটরের মাঝে স্থপতিদের ভূমিকা বেশ ঝাপসা। স্থপতিদের জন্য এখন, আগের চেয়ে আরও বেশি, জাহা হাদিদ হলেন এক বাতিঘর, স্থাপত্যের জন্য যিনি প্রচণ্ড লড়াই লড়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন আমরা বুঝতে পারি, একজন স্থপতির ভূমিকা অনাবশ্যক নয়। একজন স্থপতির ভূমিকা হল প্রশ্ন করা, নির্মিত স্থাপনা নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা এবং অবশেষে সংস্কৃতি সৃজন।' আর্কিটেক্ট দীপ্তি জাকারিয়া 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় জাহাকে এভাবেই ভারতীয় পাঠকের সামনে আনেন। চেন্নাইয়ে রেভোলিউশন বাই ডিজাইন নামের এক স্থাপত্য সংস্থা চালান তিনি। সঙ্গে আইআইটি, মাদ্রাজের শিক্ষকতা। লন্ডনের জাহা হাদিদ আর্কিটেক্টসে তিনি চার বছর কর্মরত ছিলেন। জাহা হাদিদ আর্কিটেক্টসের ওয়েব সাইটের সূত্রে জানা গেল দামাস্কাসে জন্মানো দিল্লিতে পড়াশোনা করা ভারতীয় স্থপতি বিদিশা সিংহ জাহার সংস্থায় সিনিয়র অ্যাসোসিয়েটস পদে আসীন রয়েছেন।

বাঁকের সম্রাজ্ঞী

বহুদিন ছেড়ে গেছেন মশুল, বাগদাদ। পৃথিবীর বহু দেশে বিচরণ করেছেন দিনরাত, কিন্তু জন্মভূমির স্মৃতিমেদুরতা ছিল অম্লান। ব্রিটিশ সুপার মডেল নাওমি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কথোপকথনে জাহা জানালেন, 'অনেক বছর আগে। দক্ষিণ ইরাক জলাভূমি অঞ্চল। আমার বাবা-মা আমাকে সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে যেতে দেওয়ার ব্যাপারে পাগলের মতো আচরণ করেছিল। এটা ছিল জীবন পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। পোকার কামড়ে আমি ছাড়া সবার প্রায় মারা যাওয়ার মতো অবস্থা, কারণ, তালু থেকে মাথা-তক আমি অ্যান্টি বাগ স্প্রে ব্যবহার করেছিলাম। একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করুন, আমরা একটি ডিঙিনৌকায় জলাভূমি পার হওয়ার চেষ্টা করছিলাম এবং সেখানে আমাদের পাশেই একটা মহিষ সাঁতার কাটছিল।' তিনি কেবল বিপ্লবী ও সাহসী চিন্তার ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁর ভাবনাকে কাঠামোগত রূপ দানেও ছিলেন সক্ষম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেকোনো নতুন বা প্রচলিতের বিপরীত ভাবনা ও পরিবর্তনকে মানুষ প্রথম প্রথম গ্রহণ করতে পারে না। জাহাও এই যন্ত্রণার ভুক্তভোগী। তাঁর নতুন ধরনের স্থাপত্যশিল্পকে তাঁরই সমসাময়িক স্থপতিদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। তাঁর নকশাগুলো বহুদিন আলোর মুখ দেখেনি। নানা

> মহাকাশের তারকারাজির স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা এবং বিচিত্র প্রাণীজগতের অঙ্গভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের ছাপ দেখা যায় তাঁর স্থাপত্যে। এ ছাড়াও ছিল আলো-আঁধারের লুকোচুরি।

বাধার মুখে সেগুলোর বাস্তবায়ন বন্ধ ছিল। কিন্তু লড়াকু জাহা পিছিয়ে যাননি, কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর, নিজের সৃষ্টির ওপর। তিনি বলতেন, তাঁর নাম হাদিদ এবং এই আরবি শব্দের মানে লোহা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। শেষ-তক নিজের কর্মগুণ আর যোগ্যতার বলেই হাসিল করতে পেরেছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি। ২০১৬-র ফেব্রুয়ারিতে বিবিসি রেডিয়োকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের স্থাপত্যকর্ম নিয়ে ব্যথিত সুরে তিনি তাই বলেছেন, 'আমার কখনো মনে হয় না আমি এই প্রাতিষ্ঠানিকতার অংশ। আবার এও মনে হয় না আমি বাইরের কেউ, আমি ঠিক এর প্রান্তে অবস্থান করি। অনেকটা কিনারা ধরে ঝুলে থাকার মতো আনত শিরে। এবং আমি এটাই পছন্দ করি— আমি কখনোই এই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে নই। আমি শুধু তা-ই করি, যা আমি করতে চাই, এতটুকুই, ব্যাস।'

জাহার নকশা করা স্থাপনাগুলো সুপ্রশস্ত, সুবিশাল নান্দনিক ভবন। সকল নাগরিকের ব্যবহারের জন্য এই নির্মাণগুলো নগরজীবনের অংশ। জাহার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল স্তম্ভ বা থামহীন ছাদ, যেটিকে রক্ষা করে জেড আকৃতির কোণগুলো। নির্মাণের মূল উপকরণ কাচ, স্টিল, কংক্রিট, ফাইবার গ্লাস ইত্যাদি। তিনি যথাক্রমে ভবনের অভ্যন্তরীণ, মানুষের চলাচল ও যাতায়াত এবং বাইরের নকশা করতেন। বহুমুখী প্রতিভাধর জাহার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রকৃতিকে দেখা ও বিশ্লেষণের বিশেষ ক্ষমতা। বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের ছাপ থাকত তাঁর প্রতিটি স্থাপত্য-নির্মাণে। আরবের মরুভূমি ও বালির সঙ্গে ইউরোপের পর্বতমালা, উপত্যকা, নদী ও সমুদ্রের পানি, ঢেউ সব মিলেমিশে একাকার তাঁর সৃষ্টিকর্মে। মহাকাশের তারকারাজির স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতা এবং বিচিত্র প্রাণীজগতের অঙ্গভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের ছাপ দেখা যায় তাঁর স্থাপত্যে। এ ছাড়াও ছিল আলো-আঁধারের লুকোচুরি। বাঁক ও রেখাচিত্রের বিশালতা ফুটে উঠত জাহার প্রতিটি স্থাপত্যের শিল্পকলায়। এ-কারণেই তিনি সত্যি-সত্যিই কুইন অফ কার্ভস অর্থাৎ বাঁকের সম্রাজ্ঞী।

মানুষের অবস্থান যেখানেই হোক-না-কেন, সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছেও জন্মভূমির টান থাকাই স্বাভাবিক। জাহারও ছিল সেই অমোঘ আকর্ষণ। তাই তিনি স্মৃতিচারণায় জানাচ্ছেন, 'ষাটের দশকে যখন আমি ইরাকে থাকতাম, শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রত্যেকটা মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত। আমি সবসময় একটা ছেলের গল্প বলি, সে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসত, তার বয়স ছিল ১৩ বছর। আমার মা সবসময় নিজের সন্তানের মতো দেখত। সে গরিব পরিবারের ছিল, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে ভাইয়ের মতো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সে পড়তে লিখতে পারত না। বড়ো হয়ে সে বিয়ে করল এবং নিজের একটি বাড়ি কিনেছিল। এক প্রজন্মের মধ্যে তার সব সন্তান কলেজে গিয়েছিল।' কিন্তু বর্তমান নিয়ে কিছুটা হতাশ সুরেই তিনি বলছেন, 'আমি এখন এই অগ্রসর চিন্তা আর দেখতে পাই না, এমনকী এলিটদের মধ্যেও না। সেখানে অনেক সমস্যা আছে। পুরো ইরাক ব্যাপারটা বিব্রতকর। এখন সেখানে যা ঘটছে, তার সঙ্গে অসাম্যের এবং ধনী-গরিবের মধ্যেকার সংঘর্ষের সম্পর্ক আছে। সিস্টেম পুনরায় গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রয়োজন।' দীর্ঘদিন দেশ ছেড়েছেন তিনি। কিন্তু অতীত ইরাকের সমৃদ্ধি ও এখনকার দিন দিন ধ্বংস হওয়া ইরাকের জন্য তাঁর ভাবনাচিন্তায় তিনি পুরোদস্তুর একজন দেশহিতৈষী ইরাকি।

জাহা ছিলেন অনূঢ়া। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছেন। ক্যারিয়ারই কি সংসারী হওয়ার পথ রুদ্ধ করেছে? এসব শুনে তিনি হাসতেন এবং বলতেন, 'আমি দ্বিমত করি না, অনুতাপও করি না ক্যারিয়ারিস্ট হওয়ার কারণে। কিন্তু আমি যদি যথার্থ মানুষের সন্ধান পেতাম এবং আমার যদি ছেলে-মেয়ে থাকত, আমি নিশ্চিত, আমি তা সামলে নিতে সক্ষম।' তিনি যে সামলে নিতে পারতেন সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। জাহা তাঁর নিজস্ব বিশাল ফার্ম পরিচালনা করেছেন দক্ষতার সঙ্গেই, নিজের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে গোটা দুনিয়া চরকির মতো ঘুরেছেন, স্থাপত্য ছাড়াও বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা-বক্তৃতা দিয়েছেন সারা বছর ধরে। শুধু কাজ আর কাজ, চরম ব্যস্ত তাঁর গোটা জীবন। কিন্তু একদিন সে-সময় আসে, যখন সবকিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। গত ৩১ মার্চ ২০১৬-র সকালে ফ্লোরিডার মিয়ামি হাসপাতালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর। ভুবনজয়ী স্থাপত্যশিল্পীর পৃথিবী থেকে ঘটে চিরবিদায় । কয়েক দিন আগে ব্রঙ্কাইটিসের কারণে তিনি ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। চিরপ্রস্থানের পরদিন লন্ডনে কবরস্থ হন তিনি। আমাদের কলকাতার পত্রপত্রিকা নীরব থাকলেও, তামাম দুনিয়ার মিডিয়ার প্রয়াণলেখ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি ছিলেন এ-পৃথিবীর এক মহান শিল্পী। তিনি চিরজীবী। ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা জাহা বেঁচে থাকবেন তাঁর স্থাপত্যশিল্পে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অনুসারী নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান স্থপতিদের স্থাপত্যকলায়।

জাহা হাদিদের বাবা ও মা।

মহাকবি জোহান ভলফগাঙ ফন গ্যেটে (১৭৪৯—১৮৩২) স্থাপত্য নিয়ে এক মজাদার কথা বলেছেন। তাঁর বচন হল, 'স্থাপত্য হচ্ছে জমাটবাঁধা সংগীতলহরি।'

জাহা হাদিদ তাঁর স্থাপত্যে কাঠিন্য ও পাথর কিংবা বরফ-জমা দৃঢ় অবস্থানকে পানির সরলতায় নৃত্যের ছন্দে রূপায়িত করেছেন। শুধু নারীদের মধ্যে নয়, পুরুষদের মধ্যেও কোনো স্থপতি শৈল্পিক আঙ্গিকে স্থাপত্যের এমন বাস্তবরূপ দিতে পারেননি। তিনি অসামান্য তো বটেই, অনন্যও। কিন্তু তিনি যখন বলেন, 'আর্কিটেকচার ইজ আননেসিসারিলি ডিফিকাল্ট। ইট ইজ ভেরি টাফ।' অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যা অযথা জটিল। ভীষণ কঠিন। এটা জেনে আমরা শুধু এটুকুই উপলব্ধি করতে পারি, স্থাপত্যের দুনিয়ায় ডেইম জাহা মোহাম্মদ হাদিদের সংগ্রাম কত কঠিন ছিল।

তথ্যসূত্র

১. Zaha Hadid: The Complete Buildings and Projects, Zaha hadid & Aaron Betsky, Thames & Hudson Ltd., London,1998
২. Total Fluidity: Studio Zaha Hadid, Zaha Hadid & Patrik Schumacher (Editors), Springer-Verlag/wien, Vienna, 2011
৩. The Pritzker Architecture Prize 2004 Presented to Zaha Hadid sponsored by The Hyatt Foundation (Brochure)
৪. www.zaha-hadid.com (জাহা হাদিদের আর্কিটেক্ট ফার্মের ওয়েব সাইট)
৫. জাহার চেষ্টা ছিল, তাঁর প্রতিটি স্থাপত্য দেখে যেন লিকুইড মনে হয়— জাহা হাদিদ (সাক্ষাৎকার) (www.shamprotik.com)
৬. জাহা হাদিদ: আপোষহীন প্রতিভার অনন্য স্থাপত্য, বিপাশা চক্রবর্তী (arts.bdnews.com)
৭. স্থাপত্য-শিল্পে এক বিস্ময়, রবিউল হুসাইন (www.shialpaoshilpi.com) ■

জলজ প্রাণীদের জগৎ বিচিত্র ও রহস্যময়। নানান স্বভাবের গুণে তারা চিরকালের আকর্ষণের বিষয়। তাদের নিয়ে নিরন্তর মানুষের কৌতূহল। তাদের সম্পর্কে জানবার অন্ত নেই। কেউ কেউ মানুষের নিকট-বন্ধু, কেউ-বা দূরত্বে থেকে যায়। এই পাতায় তাদের কথা।

প্রবালপ্রাচীরের রক্ষাকর্তা

এন জুলফিকার

ক-দিন ধরে এক অপূর্ব সুন্দর মাছ বর্ষার মগজে ঢুকে আছে। সারাক্ষণ তাকে নিয়ে সে ভেবেই চলেছে। সেদিন টিভির চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিতে সে গভীর সমুদ্রের এই মাছটিকে দেখে ফেলে। ব্যাস, তারপর থেকেই তার এই দশা। অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্যকারের মুখ থেকে সে জেনে গেছে সে-মাছের নাম প্যারোট ফিশ। প্যারোট ফিশ, অর্থাৎ কিনা টিয়া মাছ! সে প্রথমে নামটা শুনে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আবার ভালো করে শোনার জন্য কান পাতল। সত্যিই তো, প্যারোট ফিশই তো বলছে। ফলে এবার সে আমাকে পাকড়াও করল, ওই মাছ সম্পর্কে সব তথ্য তার চাই-ই চাই।

পরের দিন সে ও তার বন্ধু রায়ন গেল আমার বন্ধু, তার প্রণবকাকুর বাসায়। পেশায় ডাক্তার ও কবি প্রণব একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে। তার বাড়ির অ্যাকুয়েরিয়ামে বর্ষা আবার তার কাঙ্ক্ষিত মাছটার দেখা পেল। এবার সে ধরল প্রণবকে, 'বলো না কাকু, এরা কোথায় থাকে?' প্রণব মজা করে বলল, 'এই তো, আমার অ্যাকুয়েরিয়ামে।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল। আমি বললাম, 'প্রণব, এত সহজে তুই ছাড়া পাবি না।' 'তাই বুঝি?' বর্ষা বলল, 'বলো না, তুমি এই মাছ কোথায় পেলে?' প্রণব বলল, 'ওই তো যারা অ্যাকুয়েরিয়ামের মাছ বিক্রি করে, তাদের কাছে। তবে কী জানিস, এ-মাছ সবাই অ্যাকুয়েরিয়ামে রাখতে চায় না। কারণ, এরা প্রচুর পরিমাণে খায়। ওদের সম্পর্কে আরও যা জানি বলছি। তবে তার আগে তোদের হাতের খাবারটা তো শেষ করে ফেল।' লুচি-তরকারি সহযোগে খাওয়ার পর্ব সাঙ্গ হলে শুরু হল আমাদের প্যারোট ফিশ-চর্চা।

প্যারোট ফিশ নামটা এসেছে মূলত তাদের অসংখ্য দাঁতের জন্য। টিয়া মাছের সারিবদ্ধ দাঁত অত্যন্ত ঘন এবং এদের চোয়ালের হাড়ের গঠন এমন যে, তা অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো দেখায়। সামনের সারিবদ্ধ দাঁতের পরেই খাবার চিবোনোর জন্য এদের আরেক প্রস্থ দাঁত থাকে। আর এ-মাছের দেহের রংও টিয়া পাখির মতো। এরা সাধারণত সবুজ, নীল, লাল, হলুদ, কমলা ও গোলাপি রঙের হয়। কারো কারো গায়ে এই সবগুলো রঙের মিশ্রণ দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে যেখানে যেখানে প্রবালপ্রাচীর আছে, তার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে প্যারোট ফিশ বা টিয়া মাছের দেখা মেলে। রং ও দৈর্ঘ্যের হেরফেরে কমবেশি আশি প্রজাতির টিয়া মাছের খোঁজ পাওয়া যায়। স্ক্যারিডি প্রজাতিভুক্ত সর্বভুক এই মাছটি প্রায় সাত বছর বাঁচে এবং প্রজাতিভেদে এরা লম্বায় এক থেকে চার ফুট পর্যন্ত হয়। চওড়া ও বেশ মোটাসোটা প্যারোট ফিশ সাধারণত তার বুকের দু-পাশের পাখনা দিয়ে জলে ভেসে বেড়ায়। মৎস্যবিজ্ঞানীরা বলেন, শুধুমাত্র গতি বাড়ানোর দরকার হলে সে তার লেজের পাখনা ব্যবহার করে।

টিয়া মাছ সর্বভুক। তবে এদের প্রধান খাদ্য শ্যাওলা ও কোরাল বা প্রবাল। প্যারোট ফিশ এত বেশি পরিমাণে শ্যাওলা খায় যে, সর্বভুক না বলে তাকে তৃণভোজী বলাই ভালো। যদিও তারা জলের বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো পোকাও খায়। ধারালো দাঁতের সাহায্যে তারা প্রবালপ্রাচীরের ওপরে জমে থাকা শ্যাওলা কুরে কুরে খায়। পাখির ঠোঁটের মতো তাদের দাঁতের গড়ন হওয়ায় কোরালের গা থেকে শ্যাওলা কুরে খেতে তাদের বেশ সুবিধা হয়। আমাদের যেমন হাত ও পায়ের নখ বাড়ে, তেমনি টিয়া মাছের দাঁতও বাড়ে। নইলে একটা সময় সে খেতেই পারত না। কেননা, কুরে কুরে প্রবাল খাওয়ার সময় এদের দাঁত তো ক্ষয়ে যায়।

রায়ন বলল, 'আচ্ছা, এরা কি জলের অনেক নীচে থাকে?' আমি

বললাম, ‘সে তো থাকেই। সমুদ্রের তলায় গজিয়ে ওঠা প্রবালপ্রাচীর তো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা নীচে। জানিস তো, প্রবালদ্বীপের জলের মধ্যে ধুলোর মেঘ ডুবুরিদের নজরে এলেই, তারা বোঝে ওখানে অনেক প্যারোট ফিশ আছে। কেননা, তারা শ্যাওলাযুক্ত প্রবাল খাওয়ার সময় গুঁড়ো প্রবাল-মেশা জল এমনভাবে ঘুলিয়ে দেয় যে, জায়গাটা ঘোলাটে মেঘের মতো হয়ে যায়। মজার কথা হল, প্রবালদ্বীপের কাছে ডুব দেওয়া ডুবুরিরা টিয়া মাছের ডাকও শুনতে পায়! প্রবাল কুরে কুরে খাওয়ার সময় প্যারোট ফিশ নাকি অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করে!’

বর্ষা বলল, ‘বাহ্, এ তো ভারি মজার ব্যাপার! এরা তাহলে ডলফিনের মতো ডাকও ছাড়ে! আচ্ছা, এরা অন্য অনেক সামুদ্রিক মাছের মতো দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে বুঝি?’ আমি বললাম, ‘সে তো করেই। এক-একটি দলে প্রায় চল্লিশটি করে প্যারোট ফিশ থাকে। টিয়া মাছ সাধারণত ঝাঁক বেঁধে চলাফেরা করে ঠিকই, কিন্তু রাতের বেলা চিত্রটা বদলে যায়। তখন তারা দল ভেঙে জলের তলায় তাদের পছন্দের পাথরের খাঁজে খাঁজে বিশ্রাম নেয়। প্রতি রাতে তাদের মাথা থেকে এক ধরনের লালা নিঃসৃত হয়। ওই শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ প্যারোট ফিশের দেহের চারপাশে বুদ্‌বুদের মতো এক ধরনের আবরণ তৈরি করে এবং তা এদের গায়ের গন্ধও ঢেকে দেয়। এর ফলে ইল জাতীয় মাছ ও অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে টিয়া মাছ সহজে রক্ষা পায়।’

বর্ষা বলল, ‘আচ্ছা আব্বু, এই যে বললে, এরা প্রায় চার ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, তাহলে তো তার ওজনও অনেক হবে।’ ‘হ্যাঁ, সে তো বটেই। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রিন হাম্পহেড প্যারোট ফিশ, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম বোলবোমেটোপোন মিউরিকাটাম, এরা লম্বায় প্রায় চার ফুট আর ওজন হয় প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন প্রজাতির প্যারোট ফিশের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়ো প্রজাতির মাছ। আর এদের সবচেয়ে ছোটো প্রজাতি ব্লুলিপর (বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্রিপটোটোমাস রোজাস) দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ইঞ্চির মতো। এদের ওজন আর কতই-বা হবে? বড়োজোর দু-তিনশো গ্রাম।’

প্রণব বলল, ‘জানিস তো রায়ন, এরা নাকি নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনেক সমুদ্রসৈকত তৈরির অন্যতম কারিগর!’ ‘মানে?’ রায়ন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মানে হল, কোরাল রিফ কুরে কুরে শ্যাওলা ও জলজ উদ্ভিদ খাওয়ার সময় প্যারোট ফিশের পাকস্থলীতে ৭৫ শতাংশ কোরাল বা প্রবাল চলে যায়। পরে তা মিহি বালি হিসেবে শরীর থেকে নির্গত হয়। এগুলি জমে জমেই নাকি অনেক বিচ গড়ে উঠেছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে। এ-ক্ষেত্রে গ্রিন হাম্পহেড প্যারোট ফিশ একাই একশো। এরা একেক জন বছরে প্রায় নব্বই কিলোগ্রাম বালি শরীর থেকে বের করে।

টিয়া মাছ সাধারণত অগভীর জলে ডিম পাড়ে। প্রতি বারে এরা কয়েক হাজার ডিম পাড়ে। ওই ডিমগুলো জলের নীচের প্ল্যাঙ্কটনের গায়ে লেপটে থাকে। পুরুষ মাছ দিনরাত সেগুলি পাহারা দেয়। একটু বড়ো হয়ে সাঁতার কাটার উপযোগী হলেই তারা বড়ো প্যারোট ফিশগুলোর সঙ্গে প্রবাল দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আমি বললাম, ‘জানিস তো, আমরা যেমন জামা-প্যান্ট বদলাই, জীবদ্দশায় প্যারোট ফিশ তেমনই বেশ কয়েক বার তাদের দেহের রং বদলায়। এদের প্রধান শত্রু হল মোরে ইল ও হাঙর। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা প্যারোট ফিশকে প্রবালদ্বীপের রক্ষাকর্তা বলে থাকেন। এরা প্রতিনিয়ত প্রবালের গায়ে গজিয়ে ওঠা শ্যাওলা কুরে কুরে খেয়ে প্রবালকে রক্ষা করে। প্রবালপ্রাচীরের বাস্তুতন্ত্র খুব জটিল। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্যারোট ফিশের অবদান সবচেয়ে বেশি। শ্যাওলা তো প্রবালপ্রাচীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় টিয়া মাছ শিকারের ফলে প্রবালপ্রাচীরের গায়ে জমে ওঠা শ্যাওলার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই টিয়া মাছ ধরাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে ভবিষ্যতে হয়তো প্রবালপ্রাচীর ক্রমেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।’

টিয়া মাছের আবার কত্তরকম নাম। প্রিন্সেস প্যারোট ফিশ, রাস্টি প্যারোট ফিশ, রেড সি স্টিফেড প্যারোট ফিশ, স্পট লাইট প্যারোট ফিশ, গ্রিন হাম্পহেড প্যারোট ফিশ, ব্লুলিপ প্যারোট ফিশ, বাইকালার প্যারোট ফিশ, আরও কত কী। ফিলিপিনোরা এদের বলে লোরো মাছ। উত্তর ফিলিপিন্সের প্রধান ভাষা হল তাগালোগ। ওই ভাষায় লোরো কথার অর্থ হল টিয়া। জেনে রাখা ভালো, পলিনেশিয়ায় প্যারোট ফিশকে বলা হয়

> প্যারোট ফিশ নামটা এসেছে মূলত তাদের অসংখ্য দাঁতের জন্য। টিয়া মাছের সারিবদ্ধ দাঁত অত্যন্ত ঘন এবং এদের চোয়ালের হাড়ের গঠন এমন যে, তা অনেকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো দেখায়।

রাজকীয় খাদ্য। অতীতে রাজাই একমাত্র অপূর্ব সুন্দর এই মাছটি খাওয়ার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি এটা কাঁচা খেয়ে থাকতেন!

অসাধারণ রংচঙে প্যারোট ফিশ তার জীবদ্দশায় অবয়ব, রং তো বদলায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রয়োজন হলে এরা লিঙ্গও বদল করে ফেলতে পারে। বর্ষা ও রায়ন একযোগে অবাক হয়ে বলল, ‘মানে!!!’ প্যারোট ফিশের এক-একটি দলে একটি পুরুষ-মাছের সঙ্গে অনেকগুলি স্ত্রী-মাছ থাকে। তারা দল বেঁধেই প্রবালপ্রাচীরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মজার কথা কী হল, যখন ওই দলপতি পুরুষ-মাছটা মরে যায়, তখন সঙ্গে থাকা স্ত্রী-মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বলশালিনী যে-জন, সে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে তার রং ও লিঙ্গ বদলে ফেলে পুরুষ-মাছ হয়ে যায়। আর তখন থেকে সে ওই দলের কর্তা! ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৭-র উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্যে দশম স্থান অধিকারিণী (আল-আমীন মিশনের মধ্যে প্রথম)

কাজী দিলরুবা খানম

এমন রেজাল্ট মিশনে না এলে হত না

২০১৭ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২০ জন। সার্বিকভাবে পাসের হার ছিল ৮৪.২০ শতাংশ। যদিও সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের মধ্যে পাসের হার ছিল অনেকটাই কম— ৭৯.১৫ শতাংশ। রাজ্য স্তরের মেধা-তালিকায় সবার ওপরে ছিল অর্চিষ্মান পাণিগ্রাহী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। প্রথম দশের মেধা-তালিকায় দুজন মুসলমান পড়ুয়া স্থান পেয়েছিল। একজন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরের চিকিৎসক পিতার কন্যা নৌরিন হোসেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের মধ্যে পাসের হারের নিরিখে সব জেলার শীর্ষে আছে পূর্ব মেদিনীপুর। রাজ্য-গড়ের চেয়ে এই জেলার পাসের হার প্রায় ৯ শতাংশ বেশি। মেধা-তালিকায় স্থান পাওয়া অপর মুসলমান পড়ুয়াটির নাম কাজী দিলরুবা খানম। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মাদ্রাসা করণিক পিতার কন্যা দিলরুবা প্রায় সাড়ে সাত লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছিল। দিলরুবার অন্য আরেকটি পরিচয় আছে। সে আল-আমীন মিশনের ছাত্রী। আল-আমীন মিশন থেকে ২০১৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল যে ১৬৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী, দিলরুবা তাদের একজন। ৪৮০ নম্বর পেয়ে আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ-বছর প্রথম হয়েছে সে। ২০১৬ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম মেধা-তালিকায় স্থান পায় আল-আমীন মিশনের কোনো পড়ুয়া। গত বছর তহমিনা পারভিনের পর এ-বছর আবার দিলরুবা খানম মেধা-তালিকায় স্থান পেল। সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারল আল-আমীন মিশন। তহমিনা পারভিনের সাক্ষাৎকার গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল 'আল-আমীন বার্তা'য়। সেই

সাক্ষাৎকারের অংশ-বিশেষ নাকি কেটে রেখেছিল দিলরুবা। সাক্ষাৎকার দিতে বসে সে-কথাই জানাল। দিলরুবার সাক্ষাৎকারের অংশ-বিশেষ হয়তো আবার কেউ কেটে রেখে উৎসাহিত করবে নিজেকে, এগিয়ে যাবে সাফল্যের সিঁড়ির দিকে। সাফল্যকামী আগামী দিনের সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিলরুবার সঙ্গে এবার শুরু করা যাক কথোপকথন।

■ দিলরুবা, তোমার সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হই। কোথায় বাড়ি তোমাদের?

■ আমাদের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার দক্ষিণ খয়েরবাড়ি গ্রামে।

■ বাড়িতে কে কে আছেন?

■ আব্বু, মা আর আমরা চার বোন— এই আমাদের পরিবারের মানুষজন। যদিও বর্তমানে আব্বু-মা আর আমি— এই তিনজনের পরিবার আমাদের। তিন দিদিরই বিয়ে হয়ে গেছে।

■ আব্বা-মার কী নাম?

■ আব্বার নাম কাজী নুরুন্নবী। মায়ের নাম তনজিনা খাতুন।

■ আব্বা-মা কী করেন, পড়াশোনা কতদূর?

■ আব্বা উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসার করণিক। মা মাধ্যমিক পাস। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা।

■ আলিপুরদুয়ারের মেয়ে তুমি। জলপাইগুড়ি জেলা ভেঙে এই জেলা তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কার নাম অনুসারে জান?

■ না, জানি না। (একটু চুপ থেকে) কার নাম অনুসারে?

■ ১৮৭৬ সালে পরাধীন ভারতে গড়ে ওঠে দেশের অন্যতম বৃহৎ সাবডিভিশন। ওই সাবডিভিশনের প্রথম অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ছিলেন কর্নেল হেদায়েত আলি খান। তাঁর নাম অনুসারেই ওই সাবডিভিশনের নাম হয় আলিপুরদুয়ার।

■ বাহ্।

■ উত্তরবঙ্গের শেষপ্রান্তে ভুটান আসাম সীমান্তে থাক তোমরা। কেমন তোমাদের এলাকাটা?

■ আমাদের ওখানটা গ্রামীণ এলাকা। বেশিরভাগ মানুষ চাষবাস আর ছোটোখাটো ব্যাবসা করেন। ধান, পাট, আলু এইসব চাষ হয়। মিশ্র এলাকা— মানে হিন্দু, মুসলমান, নেপালি, হিন্দিভাষী লোক আছে।

■ মুসলমানের হার কেমন? তাদের অবস্থা কীরকম?

■ আমাদের গ্রামের দিকটায় ভালোই মুসলমান আছে। মুসলমানদের বেশিরভাগই মাধ্যমিক দিয়ে পড়া শেষ করে দেয়। যে দু-চার ঘর পড়াশোনা করে, তাদের বাড়ির বড়োরাও আগে পড়াশোনা করেছে।

■ ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কী করে?

■ মেয়েরা একটু বেশি পড়ে। ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ভুটানে বা অন্য কোথাও কাজে চলে যায়।

■ বেশ, এবার তোমার পড়াশোনার কথা বলো। প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনা কোথায় করেছ?

■ আমার প্রাথমিকের পড়াশোনা কাজিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরকারি প্রাইমারি স্কুল ওটা। যদিও এখন পাড়ার বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারি স্কুলে পড়ছে। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত পড়েছি খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসায়।

■ মাদ্রাসায় কেন, এলাকায় স্কুল ছিল না?

■ পাশেই স্কুল আছে— রাঙালি বাজনা মোহন সিং উচ্চবিদ্যালয়। বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে ওই স্কুলেই যায়। আমার আব্বা খয়েরবাড়ি

আমার প্রাথমিকের পড়াশোনা কাজিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরকারি প্রাইমারি স্কুল ওটা। যদিও এখন পাড়ার বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারি স্কুলে পড়ছে।

হাই মাদ্রাসায় চাকরি করেন, তাই ওখানেই ভর্তি করেছিলেন। ওই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন আমার দাদু। আমাদের দেওয়া জমিতেই মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। যেহেতু পড়াশোনায় ভালো তাই আব্বার সহকর্মীরাও ভেবেছিলেন ভালো রেজাল্ট হলে মাদ্রাসার নাম হবে, তাঁরাও চেয়েছিলেন মাদ্রাসাতেই পড়ি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একবার কথা হয়েছিল হাই স্কুলে চলে যাওয়ার। কিন্তু মাদ্রাসার স্যারেরা যেতে দেননি। স্যারেরা খুব ভালোবাসতেন।

■ কেমন পড়াশোনা করতে ছোটোবেলায়?

■ প্রথম থেকেই ফার্স্ট হতাম ক্লাসে। খুব কম স্কুল ও টিউশন কামাই করতাম। বরাবর রাত জেগে পড়াশোনা করতে পারি না। যেটুকু পড়তাম মন দিয়ে পড়তাম।

■ পড়াশোনা ছাড়া আর অন্য কিছু শিখেছ?

■ গান শিখতাম। ছবি আঁকা শিখতাম। আবৃত্তি করেছি।

■ গান শিখতে, মানে শিক্ষকের কাছে তালিম নিতে?

■ হ্যাঁ।

■ মাদ্রাসায় পড়তে আবার গানও শিখতে?

■ হ্যাঁ। কেন, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা শিখতে পারলে আমরা পারব না কেন?

■ এটা কি শুধু তোমার ইচ্ছে, না কি বাড়ির লোকেরও ইচ্ছে ছিল?

■ আমাদের পরিবারেই গানের পরিবেশ আছে। আমার দিদিরা গান শিখেছে, আমিও। গান শেখার ব্যাপারে আমার আব্বু বেশি

জোরাজুরি করতেন। ক্লাস টেনে ওঠার পর একদিন বেশি করে পড়তে হবে মনে করে গানের ক্লাস করতে যাইনি। আব্বা সেটা বুঝতে না পেরে খুব বকাবকি করেছিলেন।

■ মাধ্যমিকে কেমন রেজাল্ট হয়েছিল?

■ ২০১৫ সালের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ৭৩২ পেয়েছিলাম, ৯২ শতাংশ। রাজ্য স্তরে তৃতীয় হয়েছিলাম।

■ বাহ্। বিষয়ভিত্তিক নম্বর কেমন ছিল?

■ বাংলায় ৮৮, ইংরেজিতে ৮৪, অঙ্কে ৮৬, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৮, ভূগোলে ৯৫, ইতিহাসে ৯৫ এবং ইসলাম পরিচয়ে ৯১ পেয়েছিলাম।

■ কীরকম পড়াশোনা করতে বাড়িতে? টিউশন ছিল?

■ টিউশন ছিল তিনটে। সায়েন্সের একটা, ইংরেজির একটা আর বাংলা পড়তাম চাচাতো দাদার কাছে। স্কুল, টিউশন আর বাড়িতে পড়া ছাড়া অন্য কোনো কাজকর্ম করতাম না মাধ্যমিকের সময়।

■ মাদ্রাসা ভালো ফল করলে, মেধা-তালিকায় নাম থাকলে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, উপহার দেওয়া হয়। সেসব পেয়েছিলে তো?

■ হ্যাঁ।

■ উপহার হিসেবে কী কী পেয়েছিলে?

■ ল্যাপটপ, হাতঘড়ি, বইপত্র উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

■ আল-আমীনে কীভাবে এলে? মাদ্রাসার রেজাল্ট বের হওয়ার পর?

■ না, মাদ্রাসার রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই ভর্তির পরীক্ষায় বসেছিলাম।

■ আল-আমীন মিশনের কেমন পরিচিতি আছে তোমাদের ওদিকে? তোমরা কীভাবে খবর পেলে?

■ আমাদের ওদিকে মিশনের তেমন পরিচিতি ছিল না। শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। আব্বার স্কুলের এক সহকর্মীর জামাই শামসুল হক, উনিও একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের পাশে বাড়ি, ওই ব্রাঞ্চের সঙ্গে যুক্তও বোধ হয়, উনি পরামর্শ দেন আল-আমীন মিশনে ভর্তি করার বিষয়ে। দিনহাটাতে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাস করে খলতপুরে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম।

■ শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ কেন বেছেছিলে?

■ আমাদের বাড়ি থেকে খলতপুরের দূরত্ব আটশো কিলোমিটার। খলতপুরের ক্যাম্পাস দেখে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। কিন্তু এত দূরে যোগাযোগ করতে অসুবিধা হবে বলে বাড়ির সকলে শিলিগুড়িই পছন্দ করেছিলেন। সেক্রেটারি স্যারও একই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

■ শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চটা কেমন?

■ ভালো, ওখানে শুধু একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান পড়ানো হয়। ক্লাসগুলো ভালো হত। স্যারেরা ভালো ছিলেন। বন্ধুরা একে অপরকে হেল্প করত।

■ কীরকম রেজাল্ট করতে ওখানে?

■ ওখানে ফার্স্ট হতাম। ইলেভেনের পরীক্ষায় ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম।

■ সব ব্রাঞ্চ মিলিয়ে কেমন হত?

■ অন্য ব্রাঞ্চের ছেলে-মেয়েরা কত পাচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারিনি, আমাদের কাছে খবর থাকত না। যদিও সব ব্রাঞ্চের ছেলে-মেয়েরা একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিত।

■ আল-আমীন মিশন সম্পর্কে কীরকম ধারণা ছিল?

■ কোনো ধারণাই ছিল না। আসাম সীমান্তের জেলা আমাদের আলিপুরদুয়ার। কলকাতা থেকে আটশো কিলোমিটার আর শিলিগুড়ি থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরত্ব আমাদের গ্রামের। আমাদের ওদিককার কোনো ছেলে-মেয়ে পড়েনি আমার আগে। তাই কোনো ধারণাই ছিল না। আমাকে যখন মিশনে ভর্তি করা হয় তখন আব্বুকে অনেকে বলেছেন— কোথায় দিলেন মেয়েকে? এদিকে অন্য ভালো স্কুলে দিতে পারতেন।

■ তোমার রেজাল্টের পর নিশ্চয় কিছুটা ধারণা তৈরি হয়েছে।

■ তা তো হয়েইছে। আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের লোকজন খোঁজখবর নিচ্ছেন। দু-একজন মিশনে ভর্তিও হয়েছে।

■ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮০ (৯৬%) নম্বর পেয়ে রাজ্য স্তরে দশম হয়েছ জানলাম। বিষয়ভিত্তিক নম্বরগুলো জানাও।

■ বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৯৭, অঙ্কে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ৯২, রসায়নে ৯২।

■ কোন বিষয় বেশি ভালো লাগে?

■ অঙ্ক। কিন্তু এখন তো অঙ্কই নেই পড়াশোনার মধ্যে।

■ কেন? কী পড়ছ এখন?

■ জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের জন্য কোচিং নিচ্ছি আল-আমীন মিশন থেকেই।

■ রাজ্য স্তরে দশম হবে আশা করেছিলে? এই ফলে সন্তুষ্ট?

■ হ্যাঁ, সন্তুষ্ট। দশম হব কি না, সেটা ভাবিনি। তবে হিসেব করেছিলাম ৯৭ শতাংশ নম্বর পাব। রেজাল্ট বের হওয়ার দু-দিন আগে স্বপ্নেও দেখেছিলাম ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছি।

■ কমে গেল কেন?

■ ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালে ৩ নম্বর কম পেয়েছি। প্র্যাকটিক্যালে অনেক ছেলে-মেয়েই ফুলমার্কস পায়। ওটা পেলে ৯৭ শতাংশ নম্বরই হয়ে যেত।

■ কী করলে আরও একটু ভালো হত?

■ বাংলাটা পড়িনি, আরও বেশি পড়তে হত। ফিজিক্সে সমস্যা ছিল, ক্লিয়ার কনসেপ্ট তৈরি হয়নি কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

■ কতক্ষণ পড়াশোনা করতে?

■ মিশনে তো প্রায় সারাক্ষণই পড়া। ঘণ্টা ছয়েক ঘুমাতাম। রাত জাগতাম না।

■ তুমি সাধারণ স্কুলের থেকেও ভালো ফল করেছ, তবু জিজ্ঞাসা করি, মিশনে না এলে কি এমন চমকপ্রদ ফল হত?

■ প্রথমেই বলি বাড়ির পরিবেশ এবং স্কুল যদি ভালো হয় তাহলে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করলেও ভালো রেজাল্ট করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই সেটা থাকে না। হাতে মোবাইল পড়ে যায়, ফলে পড়াশোনা হয় না। অন্যদিকে মিশনের যে-ব্যবস্থাপনা, তা

ভালো রেজাল্ট করার জন্য খুবই উপযুক্ত। কারণ, এখানে পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় থাকে না। আমার রেজাল্টের ক্ষেত্রে বলি— এমন রেজাল্ট বাড়িতে থেকে করা শক্ত ছিল। কারণ, টিউশন পড়তে যাতায়াত করতে হত, সব এনার্জি আর সময় সেখানেই শেষ হয়ে যেত।

■ তুমি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক দিয়েছিলে। পড়াশোনার ভিত তৈরি হয়েছে সেখানেই। অনেকেরই ধারণা মাদ্রাসায় ভালো পড়াশোনা হয় না। স্কুলে অনেক ভালো পড়াশোনা হয় ...

■ এখন স্কুল ও মাদ্রাসার সিলেবাস একই। মাদ্রাসাতে বরং একশো নম্বরের ইসলাম পরিচিতি বিষয়টা বাড়তি পড়তে হয়। তবুও স্কুল ও মাদ্রাসার পড়ুয়াদের গুণগত ফলের ফারাক হয় অনেকগুলো কারণে। প্রথমত, বেশিরভাগ ভালো ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। ভালো শিক্ষক, ভালো পরিকাঠামো দেওয়ার ক্ষেত্রেও মাদ্রাসাকে অবহেলা করা হয় বলে আমার মনে হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে যে বিশেষ কোনো ফারাক নেই, তা তো আমার রেজাল্ট থেকেই স্পষ্ট। আমি যখন হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় থার্ড হলাম তখনও দু-একজন বলেছিলেন মাদ্রাসা বোর্ড বলেই পেরেছে। সেটা যদি ঠিক হত তাহলে স্কুল বোর্ডের উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করতে পারতাম না। মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ থাকলে উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করা যেত না। কারণ, ভিতটা তো মাদ্রাসাতে পড়েই তৈরি হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা ভালো করে পড়লে, যেখানেই পড়ুক, ভালো ফল হবে।

■ এবার পড়াশোনার বাইরে দু-একটা প্রশ্ন করি— সময় সুযোগ হলে টিভি দেখ?

■ বাড়ি গেলে দেখি কখনো কখনো।

■ কী দেখ, সিরিয়াল?

■ না সিরিয়াল দেখি না। রিয়ালিটি শো বা সিনেমা দেখি।

■ কার সিনেমা ভালো লাগে?

■ নির্দিষ্ট করে কারো না। যে-সিনেমার গল্প ভালো, সেই সিনেমা ভালো লাগে।

■ মোবাইলে কেমন সময় কাটাও? ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে?

■ প্রয়োজনে শুধু ফোনটুকু করি। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। মোবাইলে সময় দিলে পড়াশোনা করব কখন?

■ কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়েই তো সময় কাটাচ্ছে ...

■ আমার মনে হয় অন্তত উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার। টিভি আর মোবাইল ছাড়তে না পারলে ভালো রেজাল্ট হবে না। অনেকে তো মোবাইল অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়। মিশনে এসব নেই বলেই ছেলে-মেয়েরা মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে।

■ তোমার ফল দেখে তাহলে সবাই খুশি ...

■ আব্বু-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই খুশি হয়েছে। আব্বা-মাকে খুশি করতে পেরেছি, তাই আমিও খুশি।

> আমি যখন হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় থার্ড হলাম তখনও দু-একজন বলেছিলেন মাদ্রাসা বোর্ড বলেই পেরেছে। সেটা যদি ঠিক হত তাহলে স্কুল বোর্ডের উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করতে পারতাম না।

■ খবরের কাগজে, টিভিতে তোমাকে নিয়ে তো খবর হয়েছে অনেক। সংবর্ধনাও পেয়েছ ...

■ হ্যাঁ, খবর করেছে। সংবর্ধনাও পেয়েছি। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় থার্ড হয়ে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে উপহার পেয়েছিলাম, তেমনি উচ্চ-মাধ্যমিকেও মেধা-তালিকায় নাম থাকায় ল্যাপটপ, হাতঘড়ি, বইপত্র উপহার হিসেবে পেয়েছি। এ ছাড়া মাদারিহাটের বিডিওর তরফে, শিলিগুড়িতে একটা অনুষ্ঠানে, মাইনরিটি কমিশন থেকে, এমন অনেকগুলো জায়গা থেকে সংবর্ধনা পেয়েছি।

■ কীরকমভাবে এগোতে চাইছ?

■ এখন আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের জন্য কোচিং নিচ্ছি। প্রাথমিক লক্ষ্য এমবিবিএসে সুযোগ পাওয়া।

■ সাফল্য কামনা করছি 'আল-আমীন বার্তা'র পক্ষ থেকে।

■ ধন্যবাদ আপনাদের।

সেরার পরামর্শ

❖ প্রথমেই বলি, বিজ্ঞান বিভাগের ছেলে-মেয়েরা বাংলা ও ইংরেজি পড়তে পছন্দ করে না। কিন্তু, উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে সব বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

❖ প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি বিষয়ই পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

❖ মিশনের ক্লাস শেষ হওয়ার পর স্যারেরা কী পড়ালেন, তা বারো ঘণ্টার মধ্যে একবার দেখে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এতে যা পড়ালেন তা মনে থাকে।

❖ ম্যাথস প্রতিদিন করলে ভালো হয়। প্রতিদিন ম্যাথস করার সময় এমন কিছু চ্যাপটার বা ম্যাথস দিয়ে শুরু করবে, যা করতে ভালো লাগে।

❖ অনেকগুলো বই একসঙ্গে পড়ার চেষ্টা করবে না, একটি বইকে অনেক বার পড়ার চেষ্টা করবে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে অন্য বইকে একটু দেখবে।

❖ ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কত নম্বরের জন্য কতটুকু লিখতে হবে কীভাবে লিখতে হবে, তা খাতায় লিখে লিখে তৈরি করবে।

❖ ফিজিক্স পড়ার থেকে বেশি লিখবে, সাইড নোট দেওয়ার চেষ্টা করবে। উচ্চ-মাধ্যমিকে এর জন্য নম্বর কাটে।

❖ পরীক্ষার খাতাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবে। একটি উত্তরের শেষ ও পরের উত্তরের শুরুর মধ্যে গ্যাপ রাখবে।

❖ বাংলা ও ইংরেজির নোটে পয়েন্ট হাইলাইট করবে। বাংলায় রচনার জন্য টেনশন করবে না বা রচনা মুখস্ত করবে না। এতে সময় নষ্ট হবে।

❖ সব শেষে বলি, পড়াশোনা নিজের কাছে। প্রত্যেকের নিজের নিজের পড়ার বৈচিত্র্য আছে। নিজে যেভাবে পড়লে মনে হবে আমার পক্ষে ভালো, সেভাবেই পড়বে। কারণ, কী করলে নিজের ভালো হবে, তা একমাত্র তুমিই জান। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

টানেল

দূরকে নিকট করার চেষ্টা মানুষের বরাবরের। এর উৎস হয়তো লুকিয়ে আছে মানুষের একাকিত্ববোধে। হাজার হাজার বছর আগে বা তারও বহু আগে বিশ্বচরাচরে মানুষ যখন ছিল প্রকৃতই বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ, সেই আদিম যুগে দ্বিতীয় জনকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতাই হয়তো-বা তাকে ব্যস্ত করে তুলেছিল একদিন। পরে, ধীরে ধীরে সেই মনের ব্যাকুলতা রূপ পেয়েছে ব্যাবহারিক জীবনে। দল বেড়েছে। বেড়েছে শিকারের এবং আরও পরে কৃষির সরঞ্জামও। তাই শুধু নিজে পৌঁছে গেলেই হবে না, সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে আরও অনেককে। নিয়ে যেতে হবে খাবার বা মালপত্র। কীভাবে দ্রুত পৌঁছোনো সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে একদিন সে আবিষ্কারই করে ফেলল আশ্চর্য এক যন্ত্র। চাকা। দুটো চাকা জুড়ে তৈরি হল গাড়ি, যার ওপর দুর্বল সঙ্গীদের, শিশু আর মহিলাদের উঠিয়ে, অনেক মালপত্র-সহ অল্প আয়াসে যাওয়া সম্ভব অনেক দূরের রাস্তা। কিন্তু সেই গাড়ি টানবে কে? চাকা আবিষ্কারের অনেক আগেই মানুষ বশ করে ফেলেছিল কিছু জন্তুকে। এলাকাভেদে কোথাও কুকুর, কোথাও উট, গোরু বা মোষ কোথাও, আবার কোথাও ঘোড়া। পোষ মানানো সেই প্রাণীদেরই কাজে লাগাল গাড়ি টানতে। ঘোড়া সবার চেয়ে দ্রুতগামী। তাই যাদের ঘোড়া ছিল, তারা সুবিধে পেল বেশি। সেই সুবিধে গাড়ি আবিষ্কারের আগেও তাদের ছিল। এই সেদিন, কমবেশি পাঁচশো বছর আগে লেখা মুঘলসম্রাট জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবরের আত্মজীবনী 'বাবুরনামা'য় আমরা দেখি, একটি দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য জনৈক সৈনিক দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চার সপ্তাহের পথ পেরিয়ে গেছে মাত্র চার দিনে।

শের শাহের আমলে ডাকব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল এমনই সব ঘোড়সওয়ারের ওপর। চাকা আবিষ্কারের পরও গাড়ির ওপর নয় কেন? কারণ, ঘোরার সময় চাকার ঘর্ষণজনিত বাধা দূর করার কৌশল জানত না মানুষ। ঘসটাতে ঘসটাতে গাড়ি যেত, যেমন এখনও আমাদের গোরুর গাড়ি যায়।

ঘসটানো আটকাতে মানুষ কী করল? গাড়ির সঙ্গে চাকার সংযোগস্থলে লাগিয়ে দিল একটি যন্ত্র, যার নাম বিয়ারিং। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এক জার্মান ভদ্রলোক, কার্ল বেঞ্জ তাঁর নাম, চাকায় বিয়ারিং লাগানো গাড়ির উদ্ভাবন করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। সে-গাড়ি টানত ঘোড়া। মোটরচালিত গাড়ি আবিষ্কারের আগে এটিই ছিল দ্রুতগামী যান। ফিটন, ব্রুহাম— এমন সব নাম ছিল সেসব গাড়ির। এমনকী আজকের দুনিয়ার কুলীনতম গাড়ি রোলস রয়েসও একদিন টানত ঘোড়ায়। ততদিনে স্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে রেলগাড়ি ছুটতে শুরু করেছে।

এদিকে মানুষের তাড়া যে আরও বেশি। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, মরুভূমি, সমুদ্রের বাধা পেরিয়ে তাকে যে দ্রুত পৌঁছোতে হবে গন্তব্যে। বানিয়ে ফেলল সিধেসরল রাস্তা, দরকারে নদীর ওপর সেতু। আর সেসব সেতু কত রকমের!

সামনে পাহাড়? পরোয়া নেই। কেটে, সুড়ঙ্গ বানিয়ে তার ভেতর দিয়ে রাস্তা করে ফেলল মানুষ। একেই আমরা বলি টানেল। এই সুড়ঙ্গপথ দুনিয়ার নানা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু পাহাড় কেন, আজ আমাদের কাছে সমুদ্রও কোনো বাধা নয়। সমুদ্রের জলের তলায় বানিয়ে ফেলেছি টানেল বা সুড়ঙ্গ। এই সেদিন গঙ্গার তলা দিয়ে আমরাই যুক্ত করে ফেললাম হাওড়া আর কলকাতাকে। মেট্রো নয়, আমরা আজ এমনই কয়েকটি টানেলের পরিচয়

জানব, বিজ্ঞান আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যেগুলি মানুষের তৈরি আশ্চর্য কীর্তিরূপে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথমে দেখি টানেল (Tunnel)— এই ইংরেজি শব্দটি। লাতিন থেকে ফ্রেঞ্চ হয়ে অষ্টাদশ শতকের মাঝপর্বে শব্দটি ইংরেজি ভাষায় এসেছে। ফরাসি Tonne-এর শেষে লাতিন প্রত্যয় ella যুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে Tunnel। বাংলায় যাকে বলি সুড়ঙ্গ।

এমনই একটির নাম গটহার্ড বেস টানেল। পৃথিবীর দীর্ঘতম এবং গভীরতম রেলের সুড়ঙ্গপথ এটি। লম্বা ৫৭.১ মাইল। ১৯৪৭ সালে সুইস প্রযুক্তিবিদ এডুয়ার্ড গ্রুনার এটির পরিকল্পনা করেন। তখন এটি ছিল স্বপ্ন। বাস্তবে রূপ পেতে, অর্থাৎ কাজ শুরু করতে লেগে যায় বহু দিন। ২০০০ সালে শুরু করে টানা সতেরো বছরের পরিশ্রমে শেষ হয় এ-বছর। এ-বছরের পয়লা জুন সরকারিভাবে এটির উদ্‌বোধন হয়। বলা হচ্ছে, এই টানেলটি প্রযুক্তির শেষ কথা। আল্পস পর্বত কেটে সমুদ্রতলের আট হাজার ফুট নীচ দিয়ে বানানো হয়েছে। টানেলটি তৈরির ফলে ইতালির মিলান শহর থেকে সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ যেতে অতি মূল্যবান এক ঘণ্টা সময় কম লাগবে। তৈরির সময় আট জন শ্রমিকের প্রাণ গেছে দুর্ঘটনায়।

এটি যদি পর্বতের ভেতর দিয়ে তৈরি দীর্ঘতম টানেল হয়, তাহলে সমুদ্রের তলদেশের দীর্ঘতম টানেল কোনটি? সেটির নাম সেইকান টানেল। রয়েছে জাপানে। গটহার্ড বেস টানেল তৈরির আগে এটিই ছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথের টানেল। লম্বায় সাড়ে তেত্তিরিশ মাইল। এবং সমুদ্রের আটশো ফুট তলদেশ দিয়ে চলে গেছে জাপানের হোনশু দ্বীপ থেকে হোক্কাইডো পর্যন্ত। আগে এই জলপথে চালু ছিল ফেরি সার্ভিস। যখন প্রবল সমুদ্রঝড়ে পাঁচটি জাহাজ ডুবে প্রায় হাজার খানেক যাত্রী মারা যায়, জাপান সরকার বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করে। তারই ফল ১৯৮৮ সালে তৈরি সেইকান টানেল।

আরেকটির কথা আমরা সবাই জানি। তার নাম চ্যানেল টানেল, যেটি ইংল্যান্ডকে যুক্ত করেছে ফ্রান্সের সঙ্গে, তথা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। একতিরিশ মাইল দীর্ঘ টানেলটির তেইশ মাইল রয়েছে ইংলিশ চ্যানেলের তলায়। গাড়ি এবং রেলপথ— দুইই রয়েছে এই টানেলে। ইংল্যান্ডের কেন্ট থেকে ফ্রান্সের ক্যালিস যেতে সময় লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা!

আমাদের দেশের দীর্ঘতম টানেল কোনটি? এটির নাম পির পাঞ্জাল রেলওয়ে টানেল। রয়েছে কাশ্মীরে। ২০১৩ সালে তৈরি এই টানেলটির দৈর্ঘ্য কম নয়, ১১.২ কিলোমিটার! হিমালয়ের পির পাঞ্জাল রেঞ্জে উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেলপথে এই টানেলটি তৈরির ফলে কমে গেছে কাজিগঞ্জ থেকে বানিহালের দূরত্ব।

অনলাইন কেনাকাটা

মধ্যযুগের পশু-ব্যাবসা নিয়ে একটা গবেষণামূলক বই দিল্লি থেকে সদ্য বেরিয়েছে, যেটা খুব দরকার। কিন্তু কলকাতায় এখনও আসেনি। পাওয়া যাচ্ছে না। কী করা যায়?

খুব সহজ। হাতের স্মার্টফোনে আঙুল ছুঁয়ে ফ্লিপকার্ট বা আমাজনে গিয়ে খোঁজ করলেই তো হয়। বা, ঢুঁ মারুন অন্য কোনো অনলাইন স্টোরে। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। ছাড়ও পাওয়া যাবে। বাসে ট্যাক্সিতে বা গাড়িতে সময় আর টাকা খরচ না করে বাড়িতে বসেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত বইটি। হাতের মোবাইল থেকে। ম্যাজিক না?

না। ম্যাজিক নয়। বরং এটা আমাদের অনেকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু বই নয়— জামাকাপড়, জুতো, কলম, সানগ্লাস, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, সেলফোন, খাট, আলমারি, ওষুধ— যা চাইব, ধাঁ করে এনে দেবে আলিবাবার দৈত্যের মতো এই অনলাইন স্টোর। তা, কমপিউটারনির্ভর আজব এই বাজারটি বসল কবে? কে এর প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্ভাবক?

বলা হয়, মাইকেল অ্যাল্ডরিচ নামে এক ব্রিটিশ উদ্যোগপতি এই ব্যাবসাটির অগ্রদূত। সেটা ১৯৭৯ সাল। অ্যাল্ডরিচ বিশ্বাস করতেন, ভিডিয়োটেক্স— যা একটি পরিবর্তিত গার্হস্থ্য টিভি প্রযুক্তি— একটি সরল মেনু-চালিত কমপিউটারে পরিণত হতে পারে এবং সেটি হবে নতুন, সর্বজনীন প্রযোজ্য, অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগের মাধ্যম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল— টেলিফোন আবিষ্কারের পর যোগাযোগের এত বড়ো ক্ষমতাসম্পন্ন মাধ্যম আর আবিষ্কৃত হয়নি। পরে, এই ব্যবস্থাটি উন্নত হতে লেগে যায় পঁচিশ বছর। ইন্টারনেট এসে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দেয় অনলাইন নামের নতুন এই বাজারটিকে।

১৯৮০ সালে তিনি রেডিফঅনের অফিস বিপ্লব শুরু করেন। ফলে ভোক্তা, গ্রাহক, এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, সরবরাহকারী এবং পরিষেবা সংস্থাগুলিকে কর্পোরেট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়। ১৯৮০-র দশকে ভিডিয়োটেক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনি অনেক অনলাইন শপিং সিস্টেম ডিজাইন, তৈরি, বিক্রি, ইনসটল, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখাশোনা করেছিলেন।

মার্চ ১৯৯০ সালে টিম বার্নার্স-লি দ্বারা নির্মিত প্রথম বিশ্বজোড়া ওয়েব সার্ভার এবং ব্রাউজার বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য খোলা হয় ১৯৯১ সালে। তারপর, পরবর্তী কালে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি ১৯৯৪ সালে আনে অনলাইন ব্যাঙ্কিং। ১৯৯৪ সালে চালু হয় নেটমার্কেট বা ইন্টারনেট শপিং নেটওয়ার্ক। অবিলম্বে, ১৯৯৫ সালে Amazon.com তার অনলাইন শপিং সাইট চালু করে এবং ইবে চালু হয় ১৯৯৫ সালে। আলিবাবার সাইট Taobao এবং Tmall যথাক্রমে ২০০৩ এবং ২০০৮ সালে চালু হয়।

পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, ২০১২ সালে বিশ্ব-অনলাইন বাণিজ্যের ৩০ শতাংশই ছিল এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের। ৪৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে-বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাবসা হয়েছিল ৩৬৪.৬৬ বিলিয়ন ডলার, যা এশিয়া-প্যাসিফিকের থেকে ৬৯ বিলিয়ন ডলার কম। বিশ্ববাজারের গবেষকরা বলছেন, ২০২১ সালে এই বাজার ঠিক দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

আর ভারত? ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল অনলাইন বাজার। আশা করা হচ্ছে, ২০২১ সালে এই বাজার পৌঁছে যাবে ৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আর এই বাজার ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাজন ডট কম, ইবে, ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিল ছাড়াও কত যে সংস্থা! ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে। দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ। কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এ-বারের পাতায় পাঙুয়া ক্যাম্পাসের পড়ুয়াদের ছবি ও লেখা।

সানিয়া খাতুন। ষষ্ঠ শ্রেণি।

ভাবনা

আসরফি খাতুন
অষ্টম শ্রেণি

মেঘলা-মেঘলা দিনে
একলা একলা বসে
যায় সে কোন দূরদেশে—
গভীর চিন্তায় সে ভাবে, শুধু ভাবে
গাছপালা আকাশ পাতাল পাহাড় পর্বত।
হঠাৎ দেখে
মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি মারে—
আস্তে আস্তে মেঘের সঙ্গে মেঘ মিলিয়ে যায়—
গভীর ভাবনাও মিলিয়ে যায় সেই মেঘের মতো,
তখন সে স্বপ্ন দেখে।

ঝড়ের দিনে এক কাণ্ড

রুসদা খাতুন
ষষ্ঠ শ্রেণি

একটি গ্রামে দুটি ছোটো মেয়ে থাকত। একজনের নাম মিলি ও অপর জনের নাম মিঠু। ওরা দু-জন খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন তারা দু-জন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ খুব ঝড় উঠল। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। সবদিক কালো। এই দৃশ্য দেখে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল এবং মাঠেই কাঁদতে লাগল। কালো মেঘের জন্য চারিদিক কালো হয়ে যাওয়ার ফলে তারা বুঝতে পারেনি যে, রাত হয়ে গেছে। ঝড় থেমে গেলে তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে চাঁদ উঠেছে। তা দেখে তারা বুঝতে পারে রাত্রি হয়েছে। তখন তারা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটি বট গাছের তলায় এক যুবক বসে আছে। তা দেখে মিঠু ভাবল ছেলেটি হয়তো তাদের গ্রামের। তাই তারা ছেলেটির কাছে দৌড়ে গেল। মিলি জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে, আমরা আজ বিকেলের ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছি। এ-কথা শোনার পরও ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না। তারপর মিলি রেগে চিৎকার করে উঠে বলে, তুমি কি কানে শুনতে পাও না, না কি তুমি বোবা? এই বলে তারা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ একটি শব্দ শোনা গেল— হা হা হা। তা শুনে তারা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে, গাছের তলায় ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অদৃশ্য বাড়ি

আখিনুর খাতুন মণ্ডল
অষ্টম শ্রেণি

একদিন দুই বোন বনে ঘুরতে গিয়েছিল। গভীর বনে ঢুকে গিয়ে তারা হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সময় বয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। হঠাৎ তারা একটি অদ্ভুত বাড়ি দেখতে পেল। তারা মনে করল বাড়িটিতে সে-দিন আশ্রয় নেবে। হঠাৎ দেখল, একটি বুড়ি তাদের সামনে হাজির। তারা বুড়িটিকে বলল, আজকে রাতে কি আমরা আশ্রয় নিতে পারি? বয়স্ক মহিলাটি তাদের যেন একটু বেশি জোর করল সেই বাড়িতে থাকার জন্য। বাড়িটি ছিল ভাঙা আর বড়ো। সন্দেহ হয়, এত পুরোনো বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে? তাদের আশ্রয়ের কথা চিন্তা করে তারা দুই বোন থাকতে বাধ্য হল। বয়স্ক মহিলা তাদের আশ্রয়ের জন্য থাকার ব্যবস্থা করল। হঠাৎ তারা একটা গন্ধ পেল কিন্তু তারা ভীষণ ক্লান্ত থাকায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাঝরাতে ছাগলের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। তারা দেখল সেই ঘরের একটি জানালা খোলা অবস্থায় আছে। দুই বোনই খুব ঘাবড়ে গেল এবং জানালার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরের দৃশ্য দেখে তাদের সারা শরীর শিউরে উঠল। তারা দেখল, সেই বুড়ি একটা জ্যান্ত ছাগল চিবিয়ে খাচ্ছে, আর তার গোটা শরীর রক্তমাখা। তারা ভয়ে জ্ঞান হারাল। পরের দিন সকালে জ্ঞান ফেরার পর তারা দেখল, তারা মাটিতে পড়ে আছে, যে-জায়গাটায় বাড়িটি ছিল। কিন্তু বাড়িটিকে তারা দেখতেই পেল না।

বসন্ত

তানভী তাসনীম মোল্লা
সপ্তম শ্রেণি

আমার মনোবাঞ্ছা ফুল পাখি।
এই মুহূর্তে বসন্তকে ডেকে
বসন্তের সূর্যালোকে
আলোকিত করি ভুবনটাকে।
বসন্তের কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়ে
জলধারার ওপরে।
বসন্তের পাখি
উড়ে উড়ে যায় বাতাসের ভেতর দিয়ে—
পৃথিবী হয়ে ওঠে অনন্ত অসীম।

হাসিবা হুসনা হক। পঞ্চম শ্রেণি।

গাছের রূপ

হাসিবা খাতুন
পঞ্চম শ্রেণি

হাওয়া দিলে পাতা কাঁপে,
ফুলের গাছে ফুল ফোটে,
পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে।
মৌমাছি ঘুরে বেড়ায় ফুলের মধ্যে—
কুসুম ফুলের পাতা ঝরে সকাল-সন্ধ্যে।

রাজা ও তাঁর মেয়ে

সালমা খাতুন মল্লিক
সপ্তম শ্রেণি

এক রাজার তিন মেয়ে ছিল। তাঁর এক মেয়ে বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। দিনের পর দিন তাকে খোঁজা হয়, কিন্তু তার খোঁজ মেলে না। রাজা একদিন খুঁজতে খুঁজতে এক গোলাপ বাগিচায় ঢোকেন, কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর মেয়েকে খুঁজে পান না। তিনি খুব কাতর হয়ে পড়েন এবং বাগিচা থেকে বেরিয়ে আসেন। বাগিচা থেকে কিছু দূরে এক কুটীর দেখতে পান। এবং সেখানে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক বুড়ি চরকায় সুতো কাটছেন। সেই বুড়িকে রাজা তাঁর মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'একে আপনি দেখেছেন?' বুড়ি হাসতে হাসতে বললেন, 'এই মেয়েকে দেখেছি আমি। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে সে রানির সঙ্গে গিয়েছে। এই দেখো, এই তোমার মেয়ের ফুলের সাজি।' বুড়ির এইসব কথা শুনে রাজা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বিরাট এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন, যেখানে তাঁর মেয়ে গোলাপ বাগিচায় খেলা করছিল।

বনের বন্ধু

আওয়ালী হামিদা
সপ্তম শ্রেণি

এক গ্রামে দুই ছেলে ছিল। একজনের নাম অজয় আর একজনের নাম সুজয়। ওরা দু-জন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করত। কিন্তু ওরা বন্ধুত্ব কথার মানে জানত না। ওরা বলত, বন্ধুত্ব আবার কেমন জিনিস? একদিন অজয় আর সুজয় বনে মিষ্টি ফলের সন্ধানে গেল। হঠাৎ বনের পথে যেতে যেতে একটা বন্দি হরিণ দেখতে পেল। তারা সেই বন্দি হরিণকে মুক্ত করতে যাবে এমন সময় দেখল, এক শিকারি সেখানে বসে আছে। তখন তারা ভাবতে লাগল, হরিণটিকে কীভাবে মুক্ত করা যায়। তারা দেখতে পেল, এক কাক কোথা থেকে এসে শিকারিটিকে জ্বালাচ্ছে, আবার একটা ইঁদুর এসে সেই জালটিকে কেটে দিল। তখন সেই শিকারি দেখল, হরিণটি ছুটে পালাচ্ছে, তার সঙ্গে ইঁদুর আর কাকটিও। তখন দুই বন্ধু তাদের পেছনে দৌড়োল। হরিণ, ইঁদুর আর কাক একটা জায়গায় দাঁড়াল। ছেলেদুটোও দাঁড়াল। কাক আর ইঁদুরকে তখন হরিণ বলল, 'ধন্যবাদ বন্ধু, তোমরা না থাকলে আজ আমি মুক্ত হতে পারতাম না।' তখন ইঁদুর আর কাক বলল, 'আমরা তো তোমার বন্ধু, তোমার জন্য এইটুকু করতে পারব না?' তখন হরিণ শুনে খুব খুশি হল। তখন সুজয় আর অজয় ভাবল, সত্যি বন্ধুত্ব কি এইরকম হয়! সেই দিন থেকে ওরা বন্ধুত্ব কথার মানে বুঝতে পারল।

তাবাসুম দেওয়ান। একাদশ শ্রেণি।

Al-Ameen Mission

A socio-academic institution with a difference

1311 Al-Ameen Students Qualified in NEET-UG 2017

State Rank (General Category)

90 within 1500 | 134 within 2000 | 182 within 2500 | 257 within 3000

G-341 OBC-15	G-381 OBC-19	G-391 OBC-20	G-410 OBC-21	G-455 OBC-23	G-469 OBC-26	G-471 OBC-27	G-540 OBC-32	G-553 OBC-33
Asif Iqbal	Ambia Sultana	Masudul Kabir	Sk Hossainoor	Kabir Alam	Nilufa Yasmin	Rahamatulla	Golam Rasul	Ramish Mondal

G-568	G-581 OBC-B-33	G-588 OBC-39	G-614 OBC-43	G-616 OBC-44	G-617 OBC-45	G-626 OBC-47	G-636 OBC-B-37	G-651 OBC-49
Sarif Ahammed	Moumita Khatun	Abdur Rob Sk	Nasiruddin Sk	Jahangir Alam	Mosaraf Hossain	Sayeed Anwar	Abdul Odute Gazi	Suraj Shaikh

G-668 OBC-50	G-670 OBC-51	G-717 OBC-54	G-726 OBC-55	G-738 OBC-57	G-761 OBC-58	G-762 OBC-59	G-765 OBC-61	G-793 OBC-65
Sk Arif Hossain	Md Hefjur Alam	Taj Mohammad	Abdul Roufe	Tahamina Parvin	Md Nabab Ali	Nasim Mehmud	Abu Salam Ali	Md Rafiqul Islam

G-840 OBC-67	G-856 OBC-68	G-870 OBC-70	G-881 OBC-73	G-897 OBC-76	G-904 OBC-77	G-917 OBC-78	G-993 OBC-87	G-997 OBC-88
Arafat Mallick	Israfil Saikh	Mosaraf Hossain	Bilkis Parvin	Irfanur Rahaman	Mahamadul Hasan	Sahin Sultana	Khairul Alam	Sk Jasimuddin

G-1011 OBC-89	G-1015 OBC:B-62	G-1030 OBC-92	G-1044 OBC-93	G-1049 OBC-94	G-1062 OBC-95	G-1063 OBC-96	G-1068 OBC-97	G-1101 OBC-101
Muyazzem Reja	Ayub Khan	Abdul Asif	Imdadul Hoque	Amirul Islam	Afroj Ahmed	Banozir Yeasmin	Samima Akhtari	Tanjira Begum

Registered Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Phone: 74790 20066, 74790 20066
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Phone: 033-2229 3769, 74790 20076

আল-আমীন মিশন

একটি শিক্ষা আন্দোলনের নাম

আল-আমীন মিশন মানে মাথা তুলে বাঁচা
আল-আমীন মিশন মানে অশিক্ষা থেকে উত্তরণ
আল-আমীন মিশন মানে শূন্য থেকে শীর্ষে ওঠার সোপান

আল-আমীন মিশন

পিছিয়ে পড়া জাতির জেগে ওঠার প্রতীক

২২ জেলা | ৬৪ শাখা | বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ১২৭১০ জন
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ১৮ হাজার জন

আল-আমীন মিশন মানুষের পাশে
আপনি থাকুন আল-আমীনের পাশে

বিনা ব্যয়ে পাঠরত ৩৪৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬৫৬ জন এতিম। এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়তে আপনার দান চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে **Al-Ameen Mission Trust**-এর নামে নীচের যেকোনো ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ জানাই।
এই দান আয়কর আইনের ৮০ জি ধারায় আয়কর মুক্ত।
যেকোনো ধরনের দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্ট
রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ৭১২ ৪০৮, ফোন: ০৩২১৪-২৫৭ ২৩৫/৮০০/৮০১
সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩ বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯; ৭৪৭৯০ ২০০৬৬